প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর :
ফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

বিভূতি সেনগুপ্ত

টমাস মান-এর 'ব্ল্যাক সোয়ান'-এর বাংলা অনুবাদ
মিসেস ক্যাথারিনা মান-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত।
বাংলা অনুবাদের সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

এই শতাব্দীরই তৃতীয় দশকের কাহিনী, রাইন্ নদীর ধারে ডুসেলডর্ফ শহর। ফ্রাউ রোজেলী ভন্ টামলার নামে এক বিধবা তাঁর ছেলে এডওআর্ড ও মেয়ে অ্যানাকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন। তাঁর স্বামী লেফটেনেণ্ট কর্ণেল ভন্ টামলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকেই প্রাণ হারান—সম্মুখ সমরে নয়—একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন অনর্থক মোটর এ্যাকসিডেণ্টে। তবু যুদ্ধ-সম্পর্কিত কাজে এটা ঘটে, তাই কিছুটা সান্ত্বনা ছিল মহিলার। ছেলেমেয়েরাই যে শুধু তাদের স্নেহময় পিতাকে হারিয়েছিল তা নয়, তিনিও ভরা যৌবনের মধ্যাহ্নে এক প্রেমমুখর পতির সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর বয়স তখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই আর তাঁর সতেজ, সজীব স্বামী মহাশয়ের একটু আধটু প্রেমবৈচিত্র্যের আশায় বার টান্ ছিল না তা নয়—সেটাকে বলা যেতে পারে যে তাঁর জীবনোচ্ছল প্রাচুর্যেরই পরিচিতি।

রোজেলী ছিলেন খাস রাইনল্যাণ্ডের মেয়ে। বিশটা বছর তাঁর কেটেছে শিল্পশহর ডুইসবার্গে, স্বামীর সহবাসে। ভদ্রলোক এখানেই চাকরিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আঠারো বছরের মেয়ে আর তার চেয়ে বারো বছরের ছোটো ছেলেকে নিয়ে তিনি চলে এলেন ডুসেলডর্ফে। দুটো কারণ ছিল—প্রথম, ফ্রাউ রোজেলী ছিলেন প্রকৃতির ভক্ত, ভক্তিটা ছিল সত্যিকার, গাছপালা বাগান তাঁর প্রিয় ছিল, ডুসেলডর্ফ ছিল উদ্যান নগরী। দ্বিতীয় কারণ এই যে, অ্যানার ছিল চিত্রাঙ্কণ শিক্ষার উৎসাহ। ওখানকার শিল্পআকাদেমীর ছিল নাম, অ্যানা ঐখানেই ভর্তি হয়। তাই গত দশবছর ধরে এই ছোট্ট পরিবারটি ঐ শহরের কর্ণেলিয়াশ স্ট্রীটে নির্জন পরিবেশে ছোট একটি ভিলাতেই নিজের আস্তানা গাড়েন। বাড়িটার পরিবেশ ছিল

মনোরম, চারদিকে একটা সুদৃশ্য বাগান। রোজেলী তাকে সাজিয়েছিলেন তাঁর বিয়ের যুগের আসবাব পত্র দিয়ে। দুএকজন বন্ধু-বান্ধব আসতেন, আকাদেমীরই আর্ট ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপকরা, আর দুএকজন শিল্পব্যবসায়ী সুহৃৎরা, সস্ত্রীক ও সস্বামী। সান্ধ্যবাসর জাঁকিয়ে রাখতেন তারা গানে গল্পে-গুজবে, রঙিয়ে রসিয়ে জমজমাটি করে, পানে আহারে। রাইনল্যাণ্ডের রীতিই ছিল তাই।

রোজেলী মহিলাটি ছিলেন বেশ মিশুকে ও আলাপচারিনী। তিনি ঘুরতেন ফিরতেন, সবার সঙ্গেই ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ দহরম মহরম। শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর আতিথ্যও ছিল অবারিত। এইসব গুণ,—দরাজ দিল, সরল মন আর প্রকৃতির প্রতি প্রীতি—তাঁকে আকর্ষণীয়া করে তুলেছিল—সবাই পছন্দ করতো তাঁকে। গড়নপিটনে মানুষটির চেহারা ছিল ছোট্টখাট্টো কিন্তু আঁটসাঁট—দুটি বাদামী চোখের স্নিগ্ধতা ও কৌতুক তাকে যৌবনোচিত মর্যাদা দিতো আর কামিনীজনের স্ফূরিত হাস্য ও লাস্য তাঁর সাহচর্যকে লোভনীয় করে তুলতো, বয়সে যৌবনোত্তীর্ণা হলেও, এবং কুঞ্চিত কেশরাশিতে কিছু শ্বেত প্রলেপ পড়লেও। অবশ্য কেউ খুঁটিয়ে দেখলে হাতের চেটোর উল্টোদিকে দুচারটে তামাটে দাগও হয়তো আবিষ্কার করতো। তাঁর আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—উত্তেজিত হলে তাঁর সুগঠিত নাসিকা লাল হয়ে উঠতো—অবশ্য পাউডার প্রলেপ তিনি লাগাতেন প্রচুর। তাঁর সখাসখীরা বলাবলি করতো যে এসব ছোটখাটো খুঁত ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, বরং এই পরিবেশে রোজেলীকে মানায় ভালো।

রোজেলী ছিলেন বাসন্তিকা কন্যা। পঞ্চাশ বছর আগে এক বসন্তের সমারোহের দিনে তিনি পৃথিবীর আলো দেখেন। এই সেদিনই তাঁর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। দশবারোজন বাছাই করা সহচর সহচরী নিয়ে সরাইখানার পুষ্পপ্রস্ফুটিত বাগানে চীনে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে ভোজের আসর বসেছিল। তাঁর স্বাস্থ্যপান হলো, নীরবে সরবে মৃদুমধ্যধ্বনিদত্ত তালে। তবে ইদানীং রোজেলীর

শরীরটা ঠিক জুত্-সই যাচ্ছিলনা। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে প্রকৃতি নারীদেহের অলংঘনীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত শুরু করেছেন—অথচ রোজেলী মন দিয়ে সে কথা মেনে নিতে পারছিলোনা—কোথায় যেন বিদ্রোহ ও বিদ্বেষের সুর তাকে চঞ্চল ও তিক্ত করে তুলছিল। ফলে একটা চাপা উত্তেজনা, গরম মেজাজ, একটু অবসাদের পালা মাঝে মাঝে আপনি আসতো, যা এসব আসরে শুধু বেমানান নয়, খাপছাড়া হতো। এমন কি নির্দোষ বা নিরভিমান হাস্য পরিহাসের মধ্যেও আসতো অযাচিত কটুতা। রোজেলী তার যৌবনবতী মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো—মেয়ে অবশ্য এসব কৌতুককেলিকে আমল দিতোনা—মাঝে মাঝে তার কাছে এ ধরনের হাস্যপরিহাস অসহ্য ও প্রাণহীন মনে হতো।

রোজেলী ও তাঁর মেয়ের মধ্যে কিন্তু একটা সস্নেহ সখীত্ব সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একেতো সে বয়স্থা মেয়ে, জীবনের অনেক কিছু জেনেছে, দেখেছে, শিখেছে, তা ছাড়া তার ছোটভায়ের চেয়ে সে ছিল বয়সে ঢের বেশী বড়ো। আর সে ছিল স্পষ্টবক্তা, এমন কি মার বয়সোচিত জীবনে, যৌবনোত্তীর্ণ সীমানাতে যে পরিবর্তন আসতে পারে ও আসা স্বাভাবিক সে বিষয়ে সে শুধু অবহিত ছিল না, মন্তব্য করতেও ছাড়তো না। অ্যানার বয়স এখন উনত্রিশ, সে বিয়ে করেনি। রোজেলীর দিক থেকে সেটা ভালোই ছিল, কারণ শুধু যে সে তার মায়ের সঙ্গিনী ও প্রিয় বান্ধবীর কাজ করতো তা নয়, বুড়োবয়সে স্বামী জোটানোর চেয়ে নিজের বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে ঘরকন্না করা সহজ ছিল। মায়ের চেয়ে দীর্ঘাঙ্গী ছিল সে, চোখদুটো সেইরকমই ঘনবাদামী রং-এর, কিন্তু মায়ের মত অতো সজীব ছিল না কারণ সে ছিল একটু শীতল প্রকৃতির ভাবুনে মেয়ে। তার একটা দৈহিক ত্রুটিও এর কারণ —ছেলেবেলাতেই কুশপা নিয়ে সে জন্মায়—তাই নাচের আসরে সে ছিল অপাংক্তেয়, আর খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপেও অপারগ। ফলে সে অস্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে—সমবয়সীদের থেকে সে দূরে থাকতো,

হলো গম্ভীর, ভাবুক, অতিরিক্ত চিন্তাশীল। অবশ্য সামান্য চেষ্টাতেই সে স্কুলের পরীক্ষাগুলো টক্ টক্ করে পাশ করে গেলো কিন্তু কোন একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে আর পড়াশুনা করলোনা। শেষ পর্যন্ত বললে যে সে শিল্পী হবে, শুরু হলো স্থাপত্য বিদ্যার চর্চা কিন্তু চিত্রাঙ্কনেই তার নৈপুণ্য প্রকাশ পেলো বেশী। সেখানেও তার রীতি ছিল প্রখর বৈদগ্ধ্যের, তার রেখা প্রকৃতির অনুগা না হয়ে কিউবিষ্ট হলো, তাত্ত্বিক ও প্রতীকধর্মী হয়ে উঠলো, অঙ্ক শাস্ত্রকে প্রাধান্য দিলে। মা, মেয়ের চিত্রকলা দেখে হাসবেন না কাঁদবেন কিছুই স্থির করতে পারতেন না কারণ সেখানে বলিষ্ঠ কল্পনার সঙ্গে মিশে যেতো শুধু একটা সূক্ষ্ম সুনিপুণ বিন্যাস নয়, একটা উদ্দাম অনমনীয় প্রিমিটিভ চেতনাও—এ যেন এক ধরনের স্টাইলের তপস্যা।

মা, মেয়েকে সান্ত্বনা দিতেন—ভারী চমৎকার হয়েছে, তাৎপর্যপূর্ণ, অধ্যাপক জুমস্টেগ্ নিশ্চয়ই প্রশংসা করবেন—তিনিই তোর মধ্যে এই ধরনের অঙ্কনরীতি আবিষ্কার করেছেন, শুধু চোখ দিয়ে নয় বোধশক্তি দিয়েও দেখতে হয়—কি নাম দিয়েছিস্ ছবিটার—'সান্ধ্য বাত্যায় বৃক্ষের দল।'

হ্যাঁ, তুই যা বোঝাতে চেয়েছিস তার একটা সংকেত পাওয়া যাচ্চে বই কি—ঐ 'কোণ' ও গোল দাগগুলোই ত গাছের প্রতীক আর ঐ পাকিয়ে ওঠা শঙ্খিল লাইনগুলিই বাতাস – না, ভালোই হয়েছে চিত্তাকর্ষক—কিন্তু যদি একটা কথা বলি, কিছু মনে করিস নি, উপরের আকাশের চিহ্ন কই—সেই উর্ধ্ব প্রকৃতিকে বাদ দিলে চলবে না। আর মানুষের মনের ভাবগুলোকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে—সেখানে শিল্পের ও শিল্পীর একটা মহৎ কর্তব্য আছে। হৃদয়ের জন্য হৃদয়ের আবেগ। একটা সুন্দর স্তব্ধ জীবন যেন একটা পুষ্পময় স্থির চিত্র—ধর একটা সদ্যস্ফুট লিলিয়াক্ আঁকলি, এমনভাবে দেখালি যেন মন-মাতানো তার গন্ধ তখনও লেগে—ধর তার পাশে দুটি চমৎকার পোর্শিলেনের পুষ্পাধার—একটি চিরকালের পুরুষ একটি চিরন্তনী

নারীকে চুম্বনের ইঙ্গিত জানাচ্ছে ভঙ্গীতে আর তারই ছায়া পড়েছে চকচকে টেবিলের উপর···

থামো, মা, থামো—সত্যই তোমার কল্পনা, শুধু উদ্দাম নয়, উদ্ভটও বটে—আজকাল আর ও-ধরনের কেউ আঁকতে পারে না।

অ্যানা, সত্যি বলছিস্, এখন আর ওসব কেউ আঁকে না, যা মনকে তাতিয়ে রাখে, বাঁচিয়ে রাখে, তুই পারিস্ না? তোর শিল্পবোধ রসচেতনা তো কিছু কম নয়?

মা, ভুল বুঝো না, আমি পারি কি না পারি, সে প্রশ্ন নয়—এখনকার যুগধর্মে ও-ধরনের শিল্প প্রচেষ্টা অচল—

তাই বুঝি, তাহলে, একালের মুখে আগুন, আমাদের সেকালই ভাল—না, না কিছু মনে করিস নি—আমি ঠিক সে কথা বলছি না—যদি জীবন আর প্রগতি এটাকে অসম্ভব করে তোলে, তাহলে দুঃখ করে আর কী হবে, কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে পিছিয়ে পড়ে লাভ কী—একথা ঠিক—আর তোর মত সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনাকে বোঝা কি যার তার কাজ—সত্যিকারের গুণী প্রতিভাধর হতে হয়—আমি বিশেষ কিছু বুঝি না বটে, কিন্তু এইটুকু জানি যে তোর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

অ্যানা তাঁর রং তুলি সরিয়ে রেখে মার কপালে একটি গাঢ় চুম্বন এঁকে দিলে। রোজেলীও মেয়েকে চুমু খেলেন—মনে মনে ভাবলেন—এই ধরনের বুকচাপা রেখাঙ্কন তাঁর কাছে প্রাণহীন অসাড় অনুভূতিই জাগায় তবু মেয়ে যদি এই নিয়ে সান্ত্বনা পায়, তাতে লাভ বই লোকসান নেই।

সংসারের সাধারণ জীবনচর্চার দাবিতে প্রতিদিনের দিনচর্চায় তার এই অঙ্গহানি কতখানি দাবিয়ে রাখতে পারে সে কথা অজানা ছিল না এই বুদ্ধিমতী টামলার-তনয়ার কাছে। অল্প বয়স থেকেই তার গড়ে উঠেছিল একটা আত্মকেন্দ্রিক গর্বোদ্ধত ভাব, পুরুষরা আমল পেতোনা তার কাছে, তবু অঙ্গহীনার প্রতি অনুরাগ দেখাবার

লোকের অভাব হয় নি। কিন্তু অ্যানার কাছে পেয়েছে তারা একটা শীতল উপেক্ষা। ঔদাসীন্যের বর্মেই সে নিজেকে আবৃত করে রাখতো। শুধু একটিবার—অর্থাৎ তাদের বাড়ি বদলাবার পর সে সত্যিকারের ভালোবাসায় পড়েছিল এবং পরে তার জন্য বিশেষ লজ্জাবোধও করেছিল, কারণ এই কামনার মূলে ছিল ভদ্রলোকটির অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য—মীনকেতন ঐ দিক দিয়েই পঞ্চশর যোজনা করেছিলেন। সে ছিল একজন রসায়নশাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ কেমিষ্ট এবং ডক্টরেট্ নিয়ে ডুসেলডর্ফেরই একটা কেমিকাল ফ্যাক্টরীতে কাজ করতো। এই কমনীয়-কান্তি পুরুষটি অনেক কুমারী ও সধবা নারীর চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিয়েছিল, একথা ঠিক—বয়সের তারতম্যও সেখানে ছিল না। এই দুর্বার ভাবতরঙ্গের আঘাত থেকে অ্যানারও মুক্তি ছিল না এবং নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখা তার কঠিন হয়েছিল।

ভদ্রলোকটির নাম ছিল ডঃ ব্রুনার এবং তিনি প্রথমদিকে অ্যানার সঙ্গে খোলাখুলিই আলাপ জমাতে চেয়েছিলেন। যেখানেই দেখা হতো, সেখানেই তার সঙ্গে কথা কইতেন, সাহিত্য ও শিল্প কলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন, উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন, কখনো কখনো বা কানে কানে দুএকটা মধুর অনুযোগ, অন্য অনুরাগিনীদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য। ভাবটা এমন দেখাতেন যে তাঁর হৃদয়রাজ্যে আস্তো হাত-পা-ওয়ালা শরীর-সর্বস্ব সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অ্যানার মত বিদুষী ও শিল্পকলা রসিকাদের স্থান অনেক উঁচুতে। অ্যানার তখন বয়স কম। যৌবনের বেদনামিশ্রিত আনন্দের সজল দিনে সেও মনে মনে লাস্যমুখরা হতো এই ভেবে যে পৃথিবীতে এমন পুরুষও আছে যে নারীকে কামনা করেছে শুধু দেহের সঙ্গিনী হবার জন্য নয়, মনের রঙ্গিনী হবার জন্যও। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত বিচলিত হলেও এটা তার বুদ্ধিগম্য ছিল যে তার নিজের এই মোহ যৌবনসুলভ দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয় যখন পুরুষের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক নিয়মে সহজ। তবু সেখানে ছিল একটা গোপন আনন্দের মুখরতা, ভয় ছিল না।

তা নয়, তবু ভদ্রলোকের অভিনিবেশ, তৎপরতা ও মনোযোগ দেখে হয়তো একটু আশা হয়েছিল যে এই পুরুষ বুঝি তার পছন্দ প্রকাশ করে বিবাহের প্রস্তাব করেন।

আজও অ্যানা ভাবে যে সত্যি যদি সেদিন তিনি সে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তাহলে অ্যানার দিক থেকে সম্মতি প্রকাশে কোন কুণ্ঠাই উঠতো না। কিন্তু ঐ চরম কথাটি অনুচ্চারিত রয়েই গেলো। ভদ্রলোকের ছিল উচ্চাভিলাষ, তবু অ্যানার মত অঙ্গহীনার দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন সেটাই আশ্চর্য—বিশেষ করে অ্যানার সঙ্গে পৈতৃক অর্থও বিশেষ কিছু আসতো না। তবে দেখা গেলো, ভদ্রলোক নিজেকে জালমুক্ত করতে জানেন—কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অন্য শহরের একটি ধনবতী কন্যাকে বিবাহ করলেন। তার বাপের ছিল রাসায়নিক কারখানা—ভাল ব্যবসায়। ডুসেলডর্ফের নারীকুল হায় হায় করে উঠলো, নাগর-শিরোমণিকুলের শিকল ছিঁড়ে অকূলে ঝাঁপ দিলেন। অ্যানাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

রোজেলী তাঁর কন্যার এই কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা জানতেন। তাছাড়া এসব বিষয়ে তার ছিল একটা সহজাত জ্ঞান। মেয়ে একদিন ভাবাতিশয্যে মায়ের কোলে কেঁদেই ভাসিয়ে দিয়েছিল। শ্রীমতী টামলার অন্যদিকে খুব চতুর না হলেও মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে খবরাখবর নিতে ভালোবাসতেন এবং সামান্য ভাবভঙ্গী বা কথার আঁচ থেকেই বুঝতে পারতেন যে কে কোথায় কখন আটকে পড়লো বা জাল ছিঁড়ে পালালো। মেয়েদের ভাবভঙ্গী তিনি বেশ সমবেদনার সঙ্গেই বুঝতে পারতেন; তাছাড়া তিনি চোখ খুলেই রাখতেন কে কোথায় কার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে, কে বিব্রত হয়ে পড়লো বা কার চোখের প্রেমঘনদৃষ্টি কার দিকে দৃষ্টিপাত করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এক কথায় কোন ছেলে বা মেয়ে কে কার দিকে আকৃষ্ট হলো। বিয়ে-করা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে হৃদয়াকাশে কখন কী ঘটছে তাও ঠিক তিনি আন্দাজ করতে পারতেন, কোথায় ফাটল ধরলো, কোথায় তৃতীয় জনের

আবির্ভাব হলো, এসবও ছিল তার আনন্দ বিনোদনের উপায় স্বরূপ। কোনো মেয়ে সন্তানসম্ভবা হলে তাঁর নজর পড়তো প্রথম—তিনিই খবর দিতেন সঙ্গিনীদের কানে কানে, ইশারা করতেন—নতুন কিছু ঘটতে চলেছে।

অ্যানা তার ছোট ভাইকে লেখা পড়ায় সাহায্য করতো। সেটা মায়ের কাছে ভালই লাগতো কারণ তিনি মনে করতেন যে নারী প্রেমিক-পরিত্যক্তা বা প্রেম-বিবর্জিতা হলেও পুরুষের চেয়ে সে অন্য বিষয়ে বড়ো হতে পারে, এটা দেখানো দরকার।

রোজেলীর যে নিজের পুত্রটির প্রতি বেশী টান ছিল তা নয়—লম্বা, রোগা, লাল মাথা এই ছেলেটি মৃত বাপেরই দ্বিতীয় সংস্করণ ছিল এবং যদিও সে পড়ছিলো শিল্প সাহিত্য ইতিহাস তার সাধারণ ঝোঁক ছিল ইঞ্জিনীয়ার হবার দিকে ও ব্রিজ তৈয়ারী করবার। মার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল একটা ছাড়াছাড়া শীতল বন্ধুত্ব—সমাজে থাকতে গেলে যতটুকু হিসাব বজায় রাখা দরকার ঠিক ততটুকু—তার বেশী নয়। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়ের সঙ্গেই রোজেলীর ছিল সত্যিকার মানসিক সম্পর্ক বা দরদ। মেয়েকে তিনি সখীত্বের বা বান্ধবীত্বের চোখে দেখতেন। তাকেই তিনি আঁকড়ে থাকতেন, তার সঙ্গেই হতো আলাপ আলোচনা। অবশ্য অ্যানা ছিল চাপা ধরনের মেয়ে—উচ্ছ্বাসময়ী নয় সে। মা ও মেয়ের মধ্যে প্রায় এক তরফাই গুঞ্জন চলতো। অবশ্য মা জানতেন মেয়ের গোপন প্রেমের কথা, তার ব্যক্তিগত অবসাদের কথা। এই জন্যই সোজাসুজি খোলাখুলি ভাবেই দুজনের আলাপ আলোচনা চলতো।

মা মেনে নিয়েছিলেন মেয়ের এই মানসিক অবস্থা—দুজনে বন্ধুভাবেই হাসাহাসি করতেন এবং অ্যানার গুরুগম্ভীর প্রকাশভঙ্গী নিয়ে ঠাট্টা করতেন। মা ছিলেন প্রকৃতির ভক্ত, মেয়ে ছিল একটু চাপা বুদ্ধিজীবী মানুষ, মা চাইতেন মেয়েকে দলে টানতে, মেয়ে থাকতো চুপ করে। যখন ফুল ফুটতো, পাখি ডাকতো, বসন্তের অভ্যাগমে

বনশ্রী শ্যামল হয়ে উঠতো তখন তার হতো এক অদ্ভুত আনন্দ—সমস্ত মুখ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠতো। তখন তিনি মেয়েকে ধরে নিয়ে আসতেন বাগানে, রাস্তার বাইরে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন এবং মনে মনে আশা করতেন যে মেয়েও তারই মত—চঞ্চল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক—এবং যদিও তার পায়ের ছিল দোষ তবু শুধু উৎসাহের এবং উদ্দীপনার জোরেই মায়ের সঙ্গে সমান তালে সে মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াতো—মনে হতো তার পা যে খোঁড়া সে ভুলেই গেছে বা তার সহ্যশক্তি অসীম।

পুষ্পপ্রস্ফুটিত এই বসন্তের দিনগুলি, একটা অদ্ভুত আবেশ ও বিলাস বিভ্রম নিয়েই দেখা দিতো মা ও মেয়ের মনে। মা গদগদ হয়ে উঠতেন, মেয়েকে উদ্ভিদবিদ্যা ও ফুলের ইতিহাস শোনাতেন, কোন্ গাছটি স্ত্রীজাতীয়, কে পুষ্পকেশর রক্ষা করে—কি রকম করে পুষ্পবতী হয় ব্রততীর দল ইত্যাদি।

—গোলাপ ফোটার সময়টাতে অ্যানার কাছে ছিল এক অপরিসীম আনন্দলগ্নের দিন। এই পুষ্পরাণীকে কিরকম করে শৈশব থেকে প্রস্ফুটিত যৌবন পর্যন্ত লালন করতে হয় তার গল্প শুধ্ নয়, নিজে সহস্তে দেখিয়ে মা চমৎকৃত করে দিতেন শুধু মেয়েকে নয়, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীদের। তার শয়ন কক্ষে, বসবার ঘরে, সর্বত্র গোলাপের ছড়াছড়ি—কেউ সদ্যস্ফুট, কেউ কোরক, কোনটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত। নরম ফুলগুলি নিয়ে তাদের মোলায়েম মৃদু আবেশে তার সমস্ত মুখটাকে ডুবিয়ে দিয়ে যে অপার্থিব আনন্দ তিনি পেতেন তার তুলনা হয় না। এটা ছিল বিশেষ উত্তেজনাময় ভাবাবেগ। এর গন্ধকে তিনি স্বর্গীয় বলেই মনে করতেন—বলতেন স্বয়ং কামদেব নিদ্রিতা রতিচুম্বনেও এতো পরিমল পেতেন না। বলতেন যে অনন্তকাল ধরেও এ গন্ধ শুঁকে তৃপ্তির শেষ হয় না। অ্যানা বলতো—কি যে বলো মা, গোলাপফুলের গন্ধ যতোই ভালো হোক বা মনমাতানো হোক্ যে কোন জিনিস

একঘেয়ে হলেই তার মূল্য কমে যায়। মা জবাব দিতেন—বোকা মেয়ে, বয়স হোক্ বুঝবি—

কিন্তু মা ও মেয়ের কথাকাটাকাটি হলেও এই সময়ে দুজনেই মনের কাছাকাছি আসতেন—মেয়ে দিতো মাকে ঘন চুম্বন—দুজনেই হাসতেন।

রোজেলী বিখ্যাত ইউ-ডি-কলোন সেণ্ট ছাড়া অন্য কোন তৈয়ারী সুগন্ধি ব্যবহারই করতেন না। তাঁর কাছে প্রকৃতির সুগন্ধেরই দাম ছিল বেশী—তার সঙ্গে যেন একটা সহজ দেহজ সংযোগ বোধ করতেন তিনি। মাঝে মাঝে নিদাঘতপ্ত জুনের বিকালে যখন আকাশে বিদ্যুৎ-মেঘ ঘনিয়ে আসছে তখন তিনি বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতেন রাস্তার পারেই একটা নীচু আর্দ্র ঝোপের দিকে—সেখানে গাছ আলো করে ফুটে উঠতো জুঁই আরবার্চ জাতীয় থোকাথোকা ফুল—আর নিশ্বাস টেনে সমস্ত দেহ মন দিয়ে গন্ধ নিতেন সেই ফুলদলের—ছেলে মানুষের মতো আনন্দে তিনি ডগমগ হতেন, মেয়েকে ডেকে বলতেন—দেখ্ দেখ্—কী সুন্দর—এই ত প্রকৃতির নিজের হাতে দেওয়া দান—ভোগ করে নে যতটা পারিস—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভব দিয়ে—সশ্রদ্ধ হয়ে—আমরা ত মহাপ্রকৃতির সন্তান :

উৎসাহী মেয়ে মার হাত ধরে বলতো—জানি না বাপু, কিন্তু তুমি যে খাঁটি মাটি-মায়ের সন্তান সে তো দেখছিই—উনি কিন্তু আমার প্রতি ততো সদয় নন—এই সব বুনো গন্ধ শুঁকলেই আমার কিন্তু মাথা ধরে।

হবে না কেন, তুমি কোথায় প্রকৃতিকে ভজনা করবে নিজের সাধ ও সাধ্য দিয়ে তা না উল্টে তার বিরুদ্ধে লাগতে চাও, তোমার বুদ্ধি-বিদ্যা প্রয়োগ করে তার হিসাবনিকাশ নিতে চাও, তোমার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি দিয়ে তাকে কাটাছেঁড়া করো—ফলে এসেছে ঐ শীতলতা, আমি তোমাদের মত শ্রদ্ধা করি বটে কিন্তু আমি যদি প্রকৃতিসুন্দরী হতাম ত তোমাদের তরুণ শিল্পীদের উপর বেশ খানিকটা চটতাম।

তার পর মা মেয়েকে বললেন যে কেন তোমার ছবিতে এ সব সুগন্ধকে রংএর গাঢ়তায় দেখানো যায় না ?

গত জুন থেকেই এই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসেছিল যখন লিণ্ডেন লেবু গাছগুলি সাদাফুলে ঝলমল করছিল এবং জানালা দিয়ে দেখা যেতো যে রাস্তার ধারে ধারে ভরে গেছে এই লেবু ফুলের অনির্বচনীয় পবিত্র সুগন্ধ—যাতে রোজেলীর মন, ময়ূরের মত নেচে উঠতো, ঠোঁটে হাসি লেগেই থাকত। তিনি বলতেন—বাপু, তোমাদের শিল্পীদের আঁকা উচিত ঠিক ঐ রকম জিনিস, আর্টকে কি আর তার প্রকৃতিদত্ত রং সৌন্দর্য থেকে জোর করে কেড়ে এনে শুধু রেখায় পর্যবসিত করা যায়, খানিকটে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির স্পর্শ না দেখালে ছবি বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে কেন ? ধরো—এই যে গন্ধ—কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায় না ঠিক কিন্তু ঘ্রাণে তার অস্তিত্ব বোঝা যায়—ঐ ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়েই সে আমাদের সঙ্গে কথা কয়। ঐ অনুভূতিকে চোখের দেখার সৃষ্টিতে পরিণত করা যায় না—চেষ্টা করতে দোষ কি—তোমাদের রংতুলির পাত্র কিসের জন্য—একটু আনন্দের কণা মিশিয়ে দিতে পার না ওর সঙ্গে—আনতে পারো না ক্যানভাসে সেই অশরীরী গন্ধের সুগন্ধ—লোকে দেখুক সেই ছবি, যার নাম হবে—লিণ্ডেনের সুঘ্রাণ—বুঝবে যে কী বলতে চাইছো তুমি—

মামণি, তুমি আশ্চর্য করে দিলে—তুমি যে-সব কথা বলো কোনো শিল্প-শিক্ষক সে-সব বলাতো দূরের কথা, চিন্তাও করে না। কিন্তু তোমার কি এইটুকু বোধ নেই যে তুমি একটি আস্ত রোমান্টিক পরিমণ্ডল লালন করছো, কল্পনায় এমন একটা শিল্পচাতুর্য চাইছো যে ঐ গন্ধগুলি তুলির আগায় বর্ণে বিন্যস্ত হবে ?

আমি জানি, আমার কপালে আছে তোমাদের ঐ বিদগ্ধ বিদ্রূপ।

না। মা তুমি অন্যায় বলছ তা নয়, বললে অ্যানা গাঢ় কণ্ঠে।

অথচ এমনি এক মধ্য আগস্টের নিদাঘতপ্ত বিকালে তারা বেড়াচ্ছিল, যখন ঘটনাটি ঘটলো—যাতে ঐ ঠাট্টার সুরটাই বেজে

উঠলো। মাঠ ও জঙ্গলের ধারে বেড়াতে বেড়াতে তারা মৃগনাভির গন্ধ পেলে—প্রথমে খুব মৃদু ও মোলায়েম ভাবে, তারপর বেশ কড়া রকমের। রোজেলীই প্রথম শুঁকে গন্ধটার অস্তিত্ব পায়—গন্ধটা কোথা থেকে আসছে—মেয়েকেও স্বীকার করতে হলো একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বটে—এবং খানিকটা মৃগনাভির মত—কিন্তু দুপা এগিয়েই যা নজরে পড়লো তাতে গন্ধর উপর মমতাটা কাটে আর কি—একটা মাটির স্তূপের উপর বড় বড় মাছি ভন্ ভন্ করছে—এবং সেখানে জন্তু জানোয়ার মানুষের পরিত্যক্ত আবর্জনার সঙ্গে জঙ্গলের একটা ছোট মরা প্রাণীর পূতিগন্ধময় দেহ এবং কতকগুলো পচা গাছ গাছড়া—তাদেরই মিশ্র গন্ধটা প্রায় মৃগনাভির মত হয়ে উঠেছিল।

অ্যানা বললে—আর না, চলো মা—এবং মাকে টেনে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলে। দুজনেই দুজনের মনের বিকার চেপে চুপ করে গেলো—তার পর রোজেলী বললে—হয়েছে, আমি কখনো সুগন্ধি হিসাবে মৃগনাভি পছন্দ করতুম না, সিভেট সুগন্ধিও তাই। মনে পড়ছে ছেলেবেলায় প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্লাসে পড়েছি যে ইঁদুর বিড়াল জাতীয় অনেক জন্তুর গ্ল্যাণ্ড থেকে এক রকম রসক্ষরণ হয় যার গন্ধ অনেকটা এই রকম। কেন শীলারের 'কেবল ও লাইবে' কাব্যে পড়ো নি—মনে পড়ছেনা—সেই যে একটা ব্যাঙের মত বোকারামের চরিত্র ছিল এবং নাটকের অভিনয় মাস্টার বলতেন যে লোকটা আসতো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে আর একটা গন্ধ বেরুতো সমস্ত জায়গাটায়, তখন হাসতাম, কী আজগুবী ব্যাপারটা।

এইভাবে কথা কইতে কইতে তাদের মন মরা ভাবটা কেটে গেলো। রোজেলীর বয়স বা যৌবন এগিয়ে গেলে কি হবে—তখনও তার মন থেকে নারীজনোচিত হাসির তপ্ত লহর তোলবার ক্ষমতা নষ্ট হয় নি—যদিও তার নারীজীবনের স্বাভাবিক পরিণতির সংকটকালের পদক্ষেপ তার শারীরিক ও মানসিক অনেক কিছু অদল-

বদলের সূচনা করছিল। এই দুর্দিনে—প্রকৃতি তাকে একটি বনস্পতি সখা দিয়েছিল—সেটি হচ্ছে তার বাড়ির কাছেই প্যালেস গার্ডেনের একটি পুরাতন 'ওক' বৃক্ষ—এই বৃদ্ধ বনস্পতিও ছিল একা, এর শিকড় ও মূলের মাটি ক্ষীণ হয়ে এসে তার শিরা-উপশিরাকে প্রকট করছিল। মাথার উপরে ঝুঁটি বাধা ডালপালাগুলো নানা দিকে বিস্তৃত, কিন্তু গাছের কাণ্ডটার খানিকটা ছিল ফাঁপা—উদ্যানপালরা সিমেণ্ট দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন—অনেক ডালপালাই ম'রে গেছে শুকিয়ে—নতুন কচি পাতা আর সেথায় বেরোয় না—শুধু আকাশমুখী হয়ে চেয়ে আছে কয়েকটা শুকনো হাড়ের মত ডালপালার দল—কিন্তু ঐ মরণোন্মুখ বৃক্ষের উপরদিকে কয়েকটা ডালে তখনও বসন্তের নবজীবনের স্পর্শে জয়মাল্য দুলতো। রোজেলী সেইগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো,—ভাবতো জীবনের সজীব প্রবাহ কি রকম করে এখনও পৌঁছয় সেখানে—তার নিজের জন্মদিনটিও প্রায় একই সময়ে পড়তো—দিনে দিনে কেমন করে ওকের ফুল্ল মুকুলগুলি কুঁড়ি থেকে আস্তে আস্তে শাখায় প্রশাখায় বিস্তার লাভ করতো, তার জীবন-রহস্য তাকে মুগ্ধ করতো, ভালো লাগতো দেখতে। গাছটির খুব কাছে 'লনে'র কাছে একটা বেঞ্চ ছিল—সেইখানে গিয়ে বসলো সে অ্যানার সঙ্গে, বললে—দেখনা চেয়ে এই বৃদ্ধ বনস্পতিটাকে—কী চমৎকার—মাথা খাড়া তুলে দাঁড়িয়ে আছে—কি রকম করে ঐ মোটা শিকড়গুলো, ঠিক যেন পুরুষ্টু হাত—আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে মাটিকে—রস গ্রহণ করছে—অনেক ঝড়-ঝাপ্টা খেয়েছে গাছটা কিন্তু টি কে আছে ঠিক এবং আরও অনেকদিন থাকবে—এখনও মহাপতনের দিন আসে নি—ভিতরটা ফাঁপা, সিমেণ্টে ভর্তি, তবু নির্দিষ্ট সময়ে এখনও ঋতু পরিবর্তনে ওর জীবনীশক্তি একটু জেগে ওঠে—সর্বব্যাপী নয় বটে তবু ত খানিকটা নিজেকে সবুজ করে রাখতে পারে—এবং সেইজন্যই ওর সমাদর—যৌবনের পূর্ণ সম্ভার ওর নেই বটে কিন্তু ও নিজেকে একেবারে ফুরিয়ে যেতে দেয়নি সেইটেই ওর সাহস, ওর

বাহার, ওর তৃপ্তি। কেমন চিকচিক করছে ওর নব পল্লবিত শাখাগুলি, বাতাসে দুলচে হেলচে—ঐ একটু স্নিগ্ধতাই ওকে রমণীয় কমনীয় করেছে।

অ্যানা জবাব দিলে—যা বলছো, মা সবই ঠিক—দেখে শ্রদ্ধা হয় বটে কিন্তু আমার ভাল লাগছে না বাড়ি যাই—ব্যথা করছে।

কী বলছিস, ব্যথা কোথায়—ও তোর সেই পুরোনো রোগটা—সত্যি, তোকে এতদূর টেনে না নিয়ে এলেই হোতো—কী মন-ভোলা হয়েছি বল দিকিন—এই দেখো আমি কিনা বুড়ো গাছের দিকে চেয়ে বসে বসে কাব্যি করছি আর তোর কিনা বসে বসে পিঠে ব্যথা ধরে গেলো—নে আমার হাত ধর, চল্ যাই।

প্রথম থেকেই তার মাসিক ঋতু হবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে এই ধরনের ব্যথা উঠতো—ডাক্তাররা বলেছিল এবং ওর মা-ও নিজে জানতেন যে এর জন্য ভয় পাবার কিছু নেই—এটা হচ্ছে শারীরিক প্রকৃতি অনুসারে একটা অসুস্থতা যাকে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হয়। সেইজন্য বাড়ী ফেরবার সময় মেয়েকে সেই কথাই বোঝাচ্ছিলেন তিনি—মনে পড়ছে প্রথম যেদিন তোর ব্যথাটা উঠলো—তুইত তখন এক রত্তি মেয়ে—এতো ভয় পেয়েছিলি—কিন্তু আমি ত তোকে বলেছিলাম এতে মনমরার চেয়ে আনন্দ করাই উচিত, কারণ তুই সত্যিকার মেয়ে হয়ে উঠলি—তোর মাসিকের আগে ব্যথা ওঠে—সকলের অবশ্য হয় না, আমার হয় নি—আমি ভাবি—এ বেদনা পাওয়া স্ত্রীলোকের বুঝি সম্পূর্ণ নিজস্ব—পুরুষরা এ ধরনের বেদনায় অনভিজ্ঞ, প্রকৃতির অন্যত্রও দেখি না, অবশ্য অসুখ করলে আলাদা কথা—এই তোর বাবার কথাই ধর না—অতো বড় বীর যোদ্ধা হলে হবে কি রোগের সময় বেদনায় চেঁচিয়ে মাৎ। কিন্তু মেয়েরা—তারা বুঝি দুঃখ বেদনা ভোগ করতেই জন্মেছে—কেন না আমরা হচ্চি মায়ের জাত, সন্তান জন্মের সব কিছু দুঃখ কষ্ট আমাদের। একে ভগবানের নির্দেশ বলেই মানতে হয়—এ হচ্চে—মেয়েদের পবিত্র

কষ্ট, পুরুষরা এর কিছু বোঝে না, জানেনা—আমরা যখন যন্ত্রণায় চেঁচাই তখন তারা আমাদের সেই অচৈতন্য গোঙানী শুনে ভয়ে হাত জোড় করে বা নিজেদের গাল দেয় কিন্তু আমাদের সেই যন্ত্রণামেশানো কান্না তাদেরই উপহাস করা। যখন তোমাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এলাম তখন আমার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল—ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে বেদনায় ভুগেছি—তোর বাবা ত ঘরময় ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছিল—কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ ক্ষণটি ছিল আমার জীবনের এক পরমোৎসব রাতি—সে কান্না শুধু ত আমার কান্না নয়, আমি যে নতুন সৃষ্টি করছি সেই আনন্দের বেদনা। তোমার ভাই এডওআর্ডের সময় অতটা কষ্ট হয় নি, কিন্তু তবু যা কষ্ট হয়েছিল আমাদের প্রভু পুরুষরা, স্বামীরা তার অর্ধেক সইতে পারতো না। যখনই শরীরের কোন স্থানে বেদনা হয় তখনই বুঝতে পারা যায় প্রকৃতি সাবধান করে দিচ্ছেন যে দেহের কোথাও কোনও বিকৃতি ঘটেছে, কোন রকম অঘটন—তখন তাড়াতাড়ি তার একটা ব্যবস্থা করিয়ে নিতে নয়, বেদনার জন্য নয়, বেদনার পিছনে যে অস্বাভাবিকতা আছে তার জন্য—বেদনা তারই দূতী। অন্য সময়েও সেই এক নিয়ম--কিন্তু এই যে তোর প্রাক-ঋতু বাধক বেদনা এর কিছু অর্থ নেই, এ কোন সাবধানবাণী আনছে না—এটা হচ্চে প্রকৃতির একটা খেলা—নারীর জীবনের একটা বিশেষ ক্রিয়া—যেদিন আমরা বালিকা থেকে নারীত্বে উপস্থিত হই, সেদিন থেকে যতদিন না বৃদ্ধা হবো ততদিন মাসে মাসে প্রকৃতির এই রক্ত-উৎসবের দোল লাগবে মাতৃত্বে অভিষিক্ত হবার জন্য—এবং যখনই সেটা বন্ধ হবে তখনই সাধারণতঃ অন্য কোন অসুখ না থাকলে বুঝতে হবে যে জরায়ুর পরিপক্ক ডিম্ব বীর্য নিষিক্ত হয়ে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ তুমি গর্ভবতী হয়েছো—ত্রিশ বছর আগে যেদিন জানলাম যে তুমি কোলে আসছো সেদিন আমার এক অপূর্ব আনন্দের দিন—এবং আমার আজও মনে হলে লজ্জা পাই যখন আমি তোমার পিতার কানে

কানে এই মধুমন্ত্রটি শুনিয়েছিলাম, বলেছিলাম—রবার্ট এবারে বোধ হয়…

মা, থাক না ওসব গ্রাম্যকথা—আমার শুনতে ভাল লাগছে না।

—না, না তোমায় বিরক্ত করতে চাই না—সত্যিই আমি টামলারকে বলেছিলাম কি না—আর আমরা ত কিছু অপ্রিয় আলোচনা করছিনা—প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে যা ঘটে, যা সেই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ঘটান সেই কথাই বলছি, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই—ভাষার জন্য কুণ্ঠিত হবার কথাও নয়—যদি কিছু আমি ভুল বলি, আমায় শুধরে দিয়ো—তুমি ত আমার বিদুষী চালাক মেয়ে—তাছাড়া তুমি হচ্ছো শিল্পী—সোজাসুজি সাদাসিধে ধরনে প্রকৃতির সঙ্গে তোমাদের কারবার নয়, তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রসিয়ে জরিয়ে এঁকেজুঁকে তোমরা তাকে দেখতে চাও, দেখাতে চাও কিনা—তোমরা যে ঐ যাকে বলো—মননশীল ইণ্টেলেকচুয়াল জীব—আর সেই জন্যেই বোধহয় প্রকৃতি সময় বুঝে প্রতিশোধ নেন—বেদনা যন্ত্রণা দিয়ে।

মা,—কী যে বলো তুমি—বললে অ্যানা হাসতে হাসতে—এই মাত্র বললে আমার বুদ্ধিজীবী মন, তাহলে এইসব নির্বুদ্ধির কথা বলছো কেন?

তা যদি বলো—তোমায় একটু অন্যমনস্ক রাখতে চাই—ও সব মতামত সবই সমান আমার কাছে। কিন্তু যখন আমি মেয়েদের প্রকৃতিগত যন্ত্রণা বা কষ্টের কথা বলি তখন আমি সত্য কথাই বলি। তোমার বয়স আজ ত্রিশ—তোমার রক্তে পূর্ণযৌবনের স্রোত—তুমি আনন্দে গর্বে জীবনযাত্রা করবে এইতো আমি চাই—আমার যদি তোমার অবস্থা আজও হয় আমি হাসিমুখে পেটের যন্ত্রণা সহ্য করে যাবো—কিন্তু আমার দিন ফুরিয়ে গেছে—আমার স্ত্রী-ধর্ম ক্ষীণ হয়ে এসেছে—গত ছমাস আমার কোন ঋতুই হয়নি। বাইবেলের সারার মত আমার মধ্যে নতুন করে জীবন তৈয়ারী করবার ধারা শুকিয়ে এসেছে—কিন্তু সারা তার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছিল—সত্যই এ গল্পটি

ভারী চমৎকার। কারণ মেয়েমানুষের সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যখনই শুকিয়ে আসে, বাইরে সে যতই কান্তিমতী হোক প্রকৃতির কাছে তার কাজ ফুরিয়েছে—সে বৃদ্ধা। এ অবস্থা কল্পনা করতে পারো না তোমরা। পুরুষরা কিন্তু এ বিষয়ে ভাগ্যবান। তারা পঞ্চাশেও যৌবনবান, তোমার বাপের কথাই ধরো। আমরা জীবনে পঁয়ত্রিশ বছরই ভাগ্যবতী, তারপর আমরা জঞ্জাল।

এসব তিক্ত কথা অ্যানা কানেই নিলে না। অনেক কিছু জবাব সে দিতে পারতো, সে শুধু বললে—মা, এ কী বলছো—বর্ষীয়সী মহিলাদের জীবনের শেষ পর্বটা কি কিছু খারাপ—তার কাজ সে শেষ করেছে, প্রকৃতির ঋণ সে শোধ করেছে—এখন সে মধুরা হয়ে জীবন-যাপন করবে, তার কতো কিছু করবার আছে, দেবার আছে, তার পুত্র কন্যা আছে, পরিবার আছে। শুধু কী জীবনের যৌনতাই একমাত্র মান—পুরুষদের যাই হোক না কেন, সমাজে বর্ষীয়সী রমণীরা সম্মানই পেয়েছে—তাদের সুন্দর বার্দ্ধক্যের জীবন ত একটি পবিত্র অধ্যায়।

রোজেলী মেয়েকে কাছে টেনে বললেন—ওরে পাগলী—তোর যন্ত্রণা হচ্ছে তাই তোকে কথায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম—তুই অতো সুন্দর করে বলতে পারিস তাছাড়া তোর ভাববার ধারণাটাও চমৎকার—তুই যে আমার লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে—মাকে কেমন সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারিস—কিন্তু কি জানিস—সংসারে বয়ঃসন্ধিগুলোই হচ্চে বিদঘুটে—ঐ গাঁটগুলো পেরোবার সময় সতর্ক হতে হয়—শরীর শুকিয়ে গেলো, কিন্তু মন যদি তাজা থাকে তাহলে—এই দুইএর সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ই বড় কষ্টের। অ্যানা বললে—মা, আমি কি আর তা বুঝিনা—কিন্তু শরীর আর মন দুইই এক—দুই নিয়েই গড়ে উঠেছি আমরা—আমাদের মনোবৃত্তি ও শরীরবৃত্তি দুদিকে গেলেও ক্রমশঃ তাদের মিলতেই হবে—শরীর-ধর্মের বদলের সঙ্গে মনের ধর্মও আস্তে আস্তে বদলে যাবে—এটা হতে বাধ্য—কারণ অপটু শরীরই মনের

ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে—শেষ পর্যন্ত দেহেরই জয় হয়—এবং আত্মা বা মন তার বাহক ও ধারক হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীমতী টামলারের এসব কথা তোলবার অবশ্য নিজস্ব কারণ ছিল—এবং কেন তিনি এসব কথা বলছিলেন তার একটা উদ্দেশ্যও ছিল—সেটি আর কিছু নয়—একজন নতুন মানুষের মুখ কিছুদিনের জন্য ওদের বাড়ীতে ঘন ঘন দেখা যাচ্ছিল এবং এর ভবিষ্যত ফলাফল সম্বন্ধে অ্যানার মনে বেশ একটু নীরব ভীতিও ছিল।

এই নতুন মুখমণ্ডলের অধিকারীকে অ্যানা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতো—বুদ্ধিদীপ্তমুখ নয়—বয়স মোটে চব্বিশ, কেন্ কীটন্ নামে একজন মার্কিন যুবক যুদ্ধের সময় ওদের শহরে এসে পড়েছিল, ধনী শিল্পপতিদের স্ত্রীদের ইংরেজী শিক্ষা দিতো সে। এড্ওআর্ড একথা শুনে ওর মাকে বলেছিল যে কিছুদিন—কয়েক সপ্তাহ অপরাহ্নে ঐ ভদ্রলোকের কাছে ইংরেজী পাঠ নেবে। স্কুলে সে গ্রীক লাটিন ও অঙ্ক শিখতো, এখন ইংরেজীটা আয়ত্ত করতে পারলে, মন্দ হয় না। এইসব আজেবাজে ‘হিউম্যানিটিস’-এর কিছুটা শিখে সে পলিটেকনিকে যাবে, তার পর হয় ইংলণ্ডে না হয় টেকনলজির সেরা দেশ মার্কিন মুল্লুকে পাড়ি দেবে। এই ছিল তার কল্পনা। সেই জন্য মা যখন রাজী হলো তখন সে খুব খুশীই হলো। সোমবার বুধবার শনিবার—সপ্তাহে এই তিনদিন তার ইংরেজী পড়ার দিন ধার্য হলো। সত্যিই তার পক্ষে মজা লাগতো যে একটা নতুন ভাষাকে সে গোড়া থেকে শিখছে। তাছাড়া তার ব্যাকরণ, তার উচ্চারণ পদ্ধতি, সবই নতুন লাগতো। তাছাড়া শিক্ষকটিও ছিলেন আমুদে লোক—নিজের মাতৃভাষাকে নিয়ে শুধু কসরৎ নয় হাসিঠাট্টাও করতেন—‘ল’ এর উচ্চারণ কখন হ্রস্ব কখন দীর্ঘ হয়—‘র’ এর উচ্চারণে কখন টান পড়ে ইত্যাদি—যেমন ‘থট্’ না থ থ থ থ ট আলফ্রেড টেনিস প্লেয়ার—না প্লে-আ-আ-আর এই নিয়ে বহু হাস্যপরিহাস হতো।

শ্রীমতী টামলার ওদের হাস্যকৌতুকে মাঝে মাঝে আকৃষ্ট হয়ে দলে যোগ দিতেন এবং আলফ্রেড টেনিস প্লেয়ারের উচ্চারণ নিয়ে ব্যঙ্গও করতেন। কেন্-এর সঙ্গে তার ছেলে এডওআর্ডের কোথায় একটা সাধারণ সামঞ্জস্যও তিনি যেন মনে মনে খুঁজে পেয়েছিলেন। তুজনেই ছিল বৃষস্কন্ধ। তাছাড়া কেন্-এর লালচে চুল অপরিপক্ক বালকোচিত মুখ, ঠিক অ্যাংলো স্যাক্সনদের মত ছিল না—কোথায় একটু খাপছাড়া সুর ছিল। তার দেহ ছিল সুগঠিত যদিও তার পুরো ঢিলেঢালা জামায় সেটা সবসময়ে ঠিক সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতো না। লম্বা লম্বা পা, আর সরু কোমরে তাকে শক্তিমানই দেখাতো। তার হাতগুলো ছিল সুন্দর এবং একটা মাঝারি গোছের আংটি সে সদাই পরতো। হাবভাবে কথাবার্তায় কেন্ কীটন ছিল সম্পূর্ণ অভিমান-বর্জিত, ভাষা জার্মান, সে বলতো ইংরেজী ধরনে—যা সময়ে সময়ে হাস্যকর হয়ে উঠতো। ইতালীয় ও ফরাসী ভাষাও সে ঐ ধরনে উচ্চারণ করতো—ইউরোপের নানা দেশ সে ঘুরেছে। ফলে সব মিলিয়ে কেন্ কীটনের সাহচর্য রোজেলীর কাছে মধুরই ছিল—বিশেষ করে তার ভিতর একটা স্বাভাবিকতাই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত প্রায়ই এডওআর্ডকে পড়ানোর পর তাকে দেখা যেতো ডিনার-টেবিলে—এমন কি রোজেলী না থাকলেও। তাছাড়া মনের অন্তঃপুরে রোজেলীর একটা ধারণা ছিল—সেটা অবশ্য শোনা কথা, যে কেন্ কীটন্ মেয়েদের প্রিয় ও সকলের সাথী হবার ক্ষমতা রাখে। এই সব ভেবেই তিনি তার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন, যদিও সব সময়ে ওর কথাবার্তা ঠিক তার রুচি মত ছিলনা তবু এক এক সময় ওর মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বলতেন—চুপ চুপ, ক্ষমা কর। অবশ্য সাধারণ ভাবে এগুলো হচ্চে ভদ্র রীতিনীতির কথা, যদিও ঐ গুলোর দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও ছিল অনাবশ্যক।

এই সব খানাপিনার মাঝেই কেন্ তার বাপ-মা বংশ শিক্ষাদীক্ষার গল্প জুড়ে দিতো। তার জন্মস্থান ছিল পূর্ব মার্কিনের একটি দেশে।

তার বাপ অনেক কিছু করেছিলেন—দালালী থেকে আরম্ভ করে গ্যাস কোম্পানির ম্যানেজারী পর্যন্ত—মাঝে মাঝে জমি-বাড়ী কেনা বেচারও ঝোঁক ছিল তার—তাতে কিছু পয়সাও হয়েছিল। কেন্ সেখানকার এক বিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়েছিলেন—সেখানে অবশ্য পড়াশুনার ধরন-ধারণ ইউরোপীয় মানের মত নয়। তার পর সে যায় মিচিগানে, ঢোকে ডেট্রয়টের এক কলেজে—নিজে কাজ করে নিজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে। ডিশ্ ধোয়া, রান্নাকরা, বাগানের মালীর কাজ করা কিছুই বাদ ছিল না। মিসেস্ টামলার একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাহলে তার হাত দুটো এমন সুন্দর রইলো কী রকম করে। সে জবাব দিয়েছে যে সে-কাজ করতো একটা পোলোসার্ট আর দস্তানা পরে। সেখানে অনেকেই তাই করতো, যাতে অন্তত ঘরে হাজার শক্ত কাজ করলেও হাত দুটো নরম থেকে যেতো।

রোজেলী বললেন—এতো বেশ ভাল প্রথা। কিন্তু কীটন বললে—একে প্রথা বলছেন কেন? অবশ্য ইউরোপে কতকগুলো প্রথা প্রচলিত থাকায় প্রথা কথাটা চালু হয়ে গেছে দেশের খ্যাতি প্রতিপত্তির সঙ্গে, যেমন জার্মানদের একটা প্রথা আছে—'জীবনের লাঠি' কথাটা ব্যবহার করা—বা যেমন ইষ্টারের সময় বলা—স্ম্যাক ইষ্টার!

স্ম্যাক ইষ্টার কথাটা আবার কি জানতে চাইলেন শ্রীমতী টামলার। ওসব গ্রাম্য কথা ওঁরা শহরে শোনেন নি। এডওআর্ড হাসলো, অ্যানা মুখ বেঁকালো, শুধু রোজেলীই দেখালেন যে এ ধরনের কথাবার্তা তার ভাল লেগেছে। কীটন বললে—আমেরিকা দেশটাই আজব—নতুন দেশ কিনা—সেখানে ঠিক ইউরোপের মত কৃষক সমাজ নেই—যারা চাষবাস করান তাঁরা বড় ধরনের খামার রাখেন এবং সেখানে কোন তথাকথিত প্রথার চালু নেই। কীটনকে দেখলে বোঝা যেতোনা যে নামে ও ভঙ্গীতে আমেরিকান ছাড়া সে অন্য কোন ভাবে মার্কিন মুলুককে সমীহ করতো। তার ভাবটা ছিল—আমেরিকার জন্য কুছ পরোয়া নেই। সত্যি কথা বলতে কী আমেরিকা বলতে সে বুঝতো একদিকে

যেমন মহামহিম ডলার, আর একদিকে কিছু বুঝি আর না বুঝি গির্জেয় যাওয়ার অভ্যাস। তেমনি যেন তেন প্রকারেণ সফল হবার দুরাকাঙ্ক্ষা ওদের পেয়ে বসেছিল—আর ছিল ঐতিহাসিক আবহাওয়ার অভাব। তাতে করে কীটনের কাছে ওদের জীবনযাত্রাটা অদ্ভুত লাগতো। একটা 'ইতিহাস' সব দেশেরই থাকে—কিন্তু আমেরিকার পিছনের ইতিহাসকে বলা যেতে পারে যেন একটা সফলকাম গল্প। অবশ্য তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে, বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে কিন্তু ইউরোপে যেমন প্রত্যেক বড় শহরের পিছনে একটা বিরাট ঐতিহাসিক চেতনা আছে, ওখানে সেটার অভাব। সেই জন্য কীটন বলতো—আমেরিকার নগরগুলোর জন্য তার দরদ নেই। তাদের স্মৃতি ঐতিহ্য কদিনেরই বা—গতকাল তারা তৈয়ারী হয়েছে, আগামী কাল তাদের বিলুপ্তি হতে পারে। আর তাছাড়া ছোট শহরগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য নেই, সবই এক ধরণের আর বড়গুলো যেন এক একটা বিরাট অতিকায় দৈত্য আর ইউরোপ থেকে কিনে আনা পুরোনো দ্রব্যসম্ভার দিয়ে তাদের মিউজিয়াম সাজানো। অবশ্য চুরি করে আনার চেয়ে কিনে আনা ভালো তবু পাঁচ সাতশো বছর আগেকার জিনিসগুলো ত এক রকমের চুরিচামারি বা যুদ্ধ জয় করেই এধার ওধার নিয়ে যাওয়া হতো।

এই ধরনের শ্রদ্ধাহীন কথা শুনে সকলেরই হাসি পেত—তারা তাকে মৃদু বকতোও কিন্তু সে যা বলতো তার মূলে ছিল অতীতের প্রতি আতিশয্য ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। ইউরোপ তাকে টানতো। সপ্তমশতাব্দী-দশমশতাব্দী বলতে তার মন শুধু চঞ্চল হয়ে উঠতো না, উন্মন হয়ে উঠতো। বিশ্বযুদ্ধ না ঘটলেও ইউরোপের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের টানে সে এখানে আসতো যেন ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রার হিসাবে। ১৯১৭ সালে যুদ্ধের আরম্ভেই সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এবং তার ভয় ছিল ইউরোপে পা দেবার পূর্বেই না যুদ্ধটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তা হয়নি—যুদ্ধে যোগ দেবার সুযোগও পেয়েছিল —আহতও হয়েছিল—হাসপাতালে ছিল কয়েক সপ্তাহ—তার

মূত্রাশয়ে আঘাত লেগেছিল এবং একটি কোষই সজীব ছিল। তার জন্য সামান্য পেনশন্‌ও পেতো সে। কিন্তু তাই বলে তাকে বৃদ্ধ আহত সৈনিক বলে দেখাতো না—বরং সে নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করতো—তার আর কি হয়েছে, একটা "কিডনী" গেছে, কিছু টাকা আসছে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তাকে সৈন্যদল থেকেও সম্মানের সহিত মুক্তি দেওয়া হয়—একটা মেডেলও পায় যুদ্ধক্ষেত্রে বীর্যশৌর্যের জন্য। তারপর সে দেশে ফিরে না গিয়ে ইউরোপেই থেকে যায়—এই ঐতিহ্যময় দেশটার সঙ্গে তার মনের সম্পর্ক ছিল গভীর। সে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো কোথায় পুরাতন ফরাসী গির্জা আছে, ইতালীর প্রাসাদ, আর্ট গ্যালারী আছে—সে চলে যেতো সুইস্ গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে আর সুস্বাদু পানীয়ের কি বাহার—রাইনের লাল মদিরা, দ্রাক্ষারস সিঞ্চিত ইতালীর সুরা বা ফ্রান্সের উত্তেজনাময় আসব—পথে ঘাটে যেখানেই যাও নানা নামের সরাইখানায়, ওকের নীচে বসে যাও, লতানো গাছের পাশে প্রচুর মদ পাবে—আকণ্ঠ খাও—আর আমেরিকায় শুধুই রাম আর হুইস্কী। রামঃ, আমেরিকার লোকেরা বাঁচতেই জানে না।

হ্যাঁ জার্মানী—ঐ একটি দেশ যেটি তার শুধু প্রাণ হরণ মন হরণ করেছে—যদিও শুধু রাইনল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কিছুই সে ভালো করে জানে না—আর এই রাইনের মানুষগুলো—মেয়েছেলে—যেমন আমুদে তেমনি অতিথিপরায়ণ—আর তার শহরগুলি ট্রীয়ার, থাকেন, পবিত্র কলোন্—পবিত্র ক্যানসাস সিটি বললে কেমন শোনায়—হা, হা, ডুসেলডর্ফের পুরোনো ইতিহাস রোজেলী বা তার ছেলেমেয়ের চেয়েও বা এমন কি সেখানকার অন্যলোক বা অধ্যাপকদের চেয়েও সে বেশী জানতো—তার মেরোভিয়ান যুগের কথা, তার বারবারোসার কাহিনী, রাজকীয় প্রাসাদ, কোথায় কোন্ রাজার অভিষেক হয়েছিল, জন উইলিয়াম কে ছিল, আলবার্ট বার্গ কি করতো ইত্যাদি।

রোজেলী বলতো—দেখো তুমি শুধু ইংরেজীর অধ্যাপনা করতে

পারো না, ইতিহাসও তোমার কণ্ঠস্থ। সে বলতো যে আজকালকার যুগে প্রাচীনকালের ইতিহাস নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। রোজেলী জবাব দিতো—না, না, আমারই তোমার কাছে পড়া উচিত। অবশ্য বয়সের পার্থক্যে একজন তরুণ আর একজন বয়স্কের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ থাকবেই—তবে সে লজ্জাটা বেদনাদায়ক হলেও এমন কিছু নয়। তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গী বয়স্কদের কাছে একটু বেমানান হলেও বা তারা তাকে একটু অবহেলা, ঠাট্টা বা কৃপার সুরে দেখলেও আসলে বয়স্করা ভয় করে তরুণদের, কারণ তারা জানে যে এরা তাদের যুগ অতিক্রম করে এসেছে এবং হয়তো নিজেদের মান বাঁচাবার জন্যই ঐ ধরনের পিঠচাপড়ানো সুরে কথা কয়।

কেন্ হেসে বললে—ঠিকই বলেছেন আপনি। এডওআর্ডের মনে হলো মা যেন বই থেকে মুখস্থ বলছে, অ্যানা শুধু তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে দেখলে মায়ের দিকে। সত্যিই মা যেন বদলে যায় কীটনের সান্নিধ্যে। তার সাহচর্য ভাল লাগে—শ্রীমতী টামলারের ঘরে তার আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ লেগেই থাকে। অ্যানার কাছে তার মার এই ব্যবহার একটু বিসদৃশই লাগতো—সে দেখতো তার মার চোখে এক বিদ্যুত রেখা, কীটনের প্রতি একটা মমতাময় ভাব, তার নিজের কাছে তার ঐতিহাসিক চেতনা মনেরমতো ভালো লাগতো না বরং তার মার কথাবার্তা একটু অস্বস্তিকর ঠেকতো। একদিন তিনি নার্ভাস হয়ে জিজ্ঞাসাই করলেন মেয়েকে—হ্যাঁরে আমার নাকটা কি বেশী ঘেমেছে না লাল হয়েছে? অ্যানা অবশ্য বললে—না, কিন্তু এই সব ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাকে ভাবিয়ে তুললে যে এই যুবকটির সাহচর্য তার মার বেশী পছন্দ হয়। মা অবশ্য কী প্রশ্ন করেছিলেন তা ভুলেই গেছলেন।

অ্যানা ঠিকই দেখেছিল—রোজেলী তার ছেলের শিক্ষকের কাছে হৃদয় হারিয়ে ফেলেছিলেন—এ ফুল যেন তাড়াতাড়ি ফুটে উঠেছিল এবং এ ভাব তিনি লুকোবারও চেষ্টা করেন নি। অন্য কারুর এ রকম হলে তিনি তখনই ঠিক ধরতেন, কিন্তু নিজের বেলায় এ উপসর্গ ধরতে

পারলেন না। যেমন কেন্‌-এর কথাবার্তায় সত্যিই তিনি আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠতেন, হাসতেন, শীস্ দিতেন, চক্ষু বিস্ফারিত করে শুনতেন। তিনি নিজে অবশ্য নিজের মনের অবস্থা নিয়ে গর্ব করতেন না কিন্তু ঢাকতেও চেষ্টা করতেন না।

এই কথাটাই একদিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো অ্যানার কাছে। সে-দিন ছিল সেপ্টেম্বর মাসের গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা। মায়ের অনুমতি নিয়ে এডওআর্ডের গরম লাগায় সে তার কোটটা খুলে ফেলতে চাইলো। দেখাদেখি কেন্‌ও খুলে ফেললে তার জামা কিন্তু এডওআর্ডের কোটের নীচে ছিল হাতাওয়ালা শার্ট আর কেনের হাতকাটা গেঞ্জী শুধু—তার সুগঠিত সুন্দর দুই বাহুযুগল বেরিয়ে পড়লো। পুরুষদের সেদিকে নজর ছিল না বটে, কিন্তু অ্যানার চোখে পড়লো তার মার চঞ্চলতা। সে মনে মনে মার জন্য শুধু দুঃখিত নয়, ভীতও হলো। একজন সুগঠিত পরিপূর্ণ যৌবন তরুণের বাহুযুগল দেখেই তার মার এই ভাবান্তর—কখনো তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন কখনো জোর করে কথা বলতে লাগলেন কখনো বা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাঁর রূপজ মোহ ভরা দৃষ্টি স্থির হয়ে রইলো ঐ দুজোড়া হাতের উপর। অ্যানা আর কী করে—কেন্‌-এর ঐ ছেলেমানুষী দেখে বিরক্ত হলেও এবং মনে মনে এ বিষয়ে সন্ধিগ্ধতা পোষণ করলেও সন্ধ্যা-শীতলতা একটু বাড়লেই এবং ঘরের ফ্রেঞ্চ জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসতেই বললে যে এবারে আবার কোটগুলি পরা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীমতী টামলার খাওয়া দাওয়ার পরই মাথা ধরেছে বলে তার শয়ন কক্ষে চলে গেলেন এবং সেই অন্ধকারের নিভৃতিতে মনের গোপন দুয়ার খুলে লজ্জায়, ঘৃণায়, আনন্দে, মাধুর্যে স্বীকার করলেন নিজের কাছে—আমি ভালবাসি, ওকে আমি ভালবাসি—এতো গভীরভাবে বুঝি কারুকে ভালবাসিনি—কিন্তু আমি ওর মার বয়সী—আমার নারী জীবন শুকিয়ে এসেছে—আমি মা, আমি বয়স্থা, আমি অভিভাবিকা—আমার কী উচিত এই সব চিন্তা করা—কিন্তু কী এর রূপ, কী যৌবন,

কী দরাজ বুক, বিশাল হাত—হ্যাঁ পুরুষ একেই বলে—নারী তার সব কিছু দিয়ে দিতে পারে এ বুকের মাঝে—কিন্তু আমি এ-সব কী ভাবছি—ছিঃ ছিঃ—আমি কী লজ্জাহীনা! এক বৃদ্ধা মহিলা—না, না লজ্জা কী—রূপ যৌবন এতো বিধাতার দান—ওকে দেখলে, ওর কাছে গেলে, ওর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় আমি ফিরে গেছি আমার যৌবনের রম্য দিনে—না আমাকেই জীবন দণ্ড দান করেছে, আমিই হেরে গেছি, আমিই পরাজিত লাঞ্ছিত। না না লজ্জা করছে—লজ্জাহীনা আমি তবু মনে হচ্ছে এতে লজ্জা পাই না—আমি ওকে চাই—এমন চাওয়া এর আগে বুঝি কাউকে চাই নি—হ্যাঁ টামলার আমায় চেয়েছিল তার পূর্ণ যৌবনের শক্তিতে, আমিও তাকে সাধ্যমত আনন্দ দিয়েছি, রস জুগিয়েছি। এখন পুরুষ চাইছে না, চাইছে নারী—আমার সমস্ত নারী-সত্তা ভোগ্যা হবার জন্য উন্মুখ। এখন যেন আমিই পুরুষ, চাইছি কেন্‌কে, যেমন করে একজন যুবতীকে পুরুষ চায়। দেখছি আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে—শুনেছিও যে মেয়েমহলে ওর পশার খুব—কতো অল্পবয়সী মেয়ে ওর সঙ্গ লাভের জন্য লালায়িত হয়ে ঘুরছে। আমি কি বলছি, আমার মনে কি হিংসা জাগছে—ঐ যে লুইসা ও এমিলি রয়েছে ওদেরও তো কেন্‌ ইংরেজী পড়ায়—লুইসার বয়স আটত্রিশ আর কী রকম ভাবে তাকায়। এমিলির বয়সটা একটু বেশী—দেখতেও সুশ্রী—মোটা সোটা বোকা ধরনের, একটা স্বামীও আছে। ওদের সঙ্গে 'কেন্‌' মেশে নাকি কে জানে—তার গরম নিশ্বাস, তপ্ত চুম্বন, তার বাহুযুগলের আলিঙ্গন কি ওরাই পায়—আর আমি—আমার দাঁত কিছু খারাপ নয় যেন দন্তরুচি কৌমুদী—ভাবলে কিন্তু দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে। আর আমার শরীরের গঠন এখনও কেমন সুন্দর ধারালো—ওই হাত দিয়ে সে যদি আমায় জড়িয়ে ধরে তবে আমার সব কিছু স্নিগ্ধতা সেবা ভালবাসা আমি দিতে পারি। কিন্তু ও যে নবীন যুবক ওর জীবন নির্ঝরের সবে শুরু, আমার স্রোতের সারা। ঐযে সেদিন বোলওয়াগের্মদের গার্ডেনপার্টিতে গিয়েছিলাম—দেখি এমিলির সঙ্গে

তিনি দিব্যি চোখ ঠারাঠারি করছেন—নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু গোপন সম্মতি আছে—তখনই আমার বুকটা যেন কষ্টে ভেঙে পড়েছিল—কেন তখন তা বুঝতে পারি নি—এখন বুঝছি। অ্যানা বলে, মন আর দেহ অঙ্গাঙ্গী চলে—মনে ভাব এলেই দেহে তার তরঙ্গ খেলে। অ্যানা অনেক কিছু জানে অনেক কিছু বোঝে—না বোঝে না, নিজের জীবনে অনেক কিছু কষ্ট সহ্য করেছে সে—সে ভালবেসেছে—ভালবেসে কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু দেহ আর মন যখন নারীত্বের পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করবে তখন প্রকৃতি মনকে ফুলে ফলে সৌরভে ভরিয়ে দিতে পারে—না, না দেরী হয় নি—প্রেম, কামনা, হিংসা—সবই কিছু ফলতে পারে দেরীতে। বৃদ্ধা সারার গল্প মনে পড়ছে—বৃদ্ধা সারা হেসেছিল—ভগবান রাগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি যদি দয়া করেন ত আবার সব হতে পারে। আমি দেহ ও মনের পরিবর্তনের যাদুতে বিশ্বাস করি—নতুন করে আমার মনে বসন্তের এই আবাহনকে আমি শ্রদ্ধা করি।

রাত্রির অনেকক্ষণ তিনি অধীর হয়ে এই সব কথা মনে মনে আলোচনা করেছিলেন—তারপর ভোরের দিকে বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে সকালে উঠেই প্রথম ভাবনা এই যে তাঁর জীবনে নতুন জোয়ার এসেছে, যে কামনা তাঁকে আবার আলোড়িত করছে তাকে কি রকম করে যৌবনান্তে ধরে রাখবেন—এ কথা তাঁর মনে হলো না যে এইসব চিন্তাকে অন্তত নীতির দিক থেকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত। প্রেমোন্মাদিনী হতভাগিনী শুধু নিজের কথাতেই ডগমগ—এই বয়সেও কিরকম করে আর একটি মানুষকে নিজের করা যায়। অবশ্য ভগবানের উপর তার বিশেষ বিশ্বাস কখনও ছিল না—ওসব নিয়ে মাথাও ঘামাতেন না তিনি। কিন্তু প্রকৃতির এই নতুন দানকে তিনি অবহেলা করতে পারলেন না, চাইলেনও না। এ যেন হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে নতুন করে ফিরে পাওয়া—এ এক যেন গোপন মানস অভিসার, একেই গোপনেই লালন করা উচিত। এ হচ্চে অসময়ের ফল, একে

লুকিয়ে রাখতে হবে তাঁর মেয়ের, কাছ থেকেও—কেউ যেন না কিছু সন্দেহ করে—তার এই নবযৌবন লাভের কদর্থ করে, তার শুভ্র সুন্দর প্রেমকে বিকৃত করে দেখে।

তবু কীটনের সঙ্গে তার মনের সম্পর্কের মাঝে একটা দীনতা ও বাধ্যতা ছিল যা সামাজিক ভাবে অসম্ভব। অথচ রোজেলী তার ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে পারছিলেন না এবং যেটা অ্যানার মত তীক্ষ্ণধী মেয়ের চোখে পড়েছিল। তাঁর অতিরিক্ত হাসি খুশি প্রথম প্রথম সমস্তটাকে বিসদৃশ করে তুলেছিল। এমন কি এক এক সময় এডওআর্ডেরও এটা নজরে পড়েছিল এবং ভাই বোন দুজনেই মার এই অস্বাভাবিক আচরণে মুখ নীচু করে থাকতো এবং কিছু বুঝতে না পেরে এই পীড়াদায়ক নিস্তব্ধতার সময় এর ওর দিকে চাইতো।

এডওআর্ড একদিন আর থাকতে না পেরে এবং ব্যাপারটি কি জানতে চেয়ে অ্যানাকে জিজ্ঞাসা করলে—মার কী হয়েছে বল দিকিন্, কীটনকে কি তার ভাল লাগছে না—অ্যানা চুপ করে রইলো দেখে মুখটা লম্বা করে বললে—না, তাকে বড্ড বেশী পছন্দ হয়েছে। অ্যানা জবাব দিলে একটু বকুনির সুরে—খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার কী মনে হচ্ছে শুনি—এ বয়সে তোমার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী—নিজের চরকায় তেল দাও—ও সব চিন্তা শিকেয় তোলো। কিন্তু অ্যানা বলেই চললো—দেখো, মায়ের এখন এমন বয়স যখন সব মেয়েরই সারা দেহে মনে একটা উত্তেজনা আসে, স্নায়ুর সামঞ্জস্যের অভাব হয়—স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, মানসিক চাঞ্চল্য বাড়ে।

বিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্রটি বললে—আমার পক্ষে অত্যন্ত নতুন ও জরুরী কথা শোনালে দিদি—তার পক্ষে এই সব সাধারণ কথা অত্যন্ত সাধারণই ছিল—তাদের মার যে শুধু সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে তা নয়, তার চেয়েও কিছু বেশী এবং এইটুকু বোঝবার তার বয়স হয়েছিল যে তার বয়স্কা দিদিও মায়ের ব্যবহারে বেশ চঞ্চল ও

চিন্তিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য সে নিজে না হয় ছেলেমানুষ ও বোকা হতে পারে—সে তার মাকে বলতে পারে যে আর দরকার নেই মাষ্টার মশায়ের—সে যথেষ্ট ইংরেজি শিখেছে—এখন নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে। মাষ্টার মশাইএর এখন চলে যাওয়াই ভাল।

অ্যানা বললে—তাই কর এডওআর্ড, মাকে বলে দেখ্। তাই সে মাকে বললে—আমার ইংরেজী পড়ার আর দরকার কী—খরচাও অনেক—তা ছাড়া মিঃ কীটনের কাছে আমি ত বেশ শিখে নিয়েছি—যতটা পারি নিজেই করে নেবো এখন—তাছাড়া এটা একটা বিদেশী ভাষা—দেশেত আর দরকার নেই—যখন ইংলণ্ড আমেরিকায় যাব তখন আলাদা কথা—আর সে হয়ে যাবে। আমার পরীক্ষায় এখন ত আর ইংরেজী নেই—এখন যেগুলো পরীক্ষার বিষয়, সেগুলোতেই মন দেওয়া দরকার যেমন গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষা—তাই বলছিলাম কী—এখন মিঃ কীটনকে বললে হয় না—তিনি অবশ্য অনেক খেটেছেন আমার জন্য, অনেক করেছেন—উপস্থিত আর তাঁকে দরকার নেই আমার—অবশ্য তাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে বন্ধুর মত।

শ্রীমতী টামলার কিন্তু তৎক্ষণাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন—এসব কী বলছ এডওআর্ড—আমি শুধু আশ্চর্য হচ্ছি না একটু হতাশও হচ্ছি—আমি এ অনুমোদন করি না—তুমি হয়ত ভাবচো যে তোমার পড়ার জন্য এতো টাকা নাইবা খরচ করলাম—কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ ত ভাবতে হবে—আর তাছাড়া অ্যানাকে আকাডেমিতে পড়িয়েছি—তোমাকেও নানা ভাষা পড়তে হবে—এটা আমার কর্তব্য—আর আমাদের অবস্থা ঠিক ততটা খারাপ নয় যে যা করা উচিত তা করতে পারব না। আমি বুঝতেই পারছি না যে তুমি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছো—তাছাড়া ইংরেজী ভাষা বা সাহিত্য অর্ধেক পড়ে ছেড়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না—তা ছাড়া আমি তোমার জন্য এটুকু যদি সহ্য না করি তাহলে কি চলে? তুমি

ভাল করে ইংরেজীটা আয়ত্ত করে নাও, মোটে সপ্তাহে কয়েকদিন পাঠ নেওয়া—এই তো—তাছাড়া দেখো, আর একটা দিক আছে—কেন্, অর্থাৎ মিঃ কীটনের আমাদের পরিবারের সঙ্গে এমন একটা সৌজন্যপূর্ণ সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে যে ওঁকে বলা যায় না যে মশাই, আপনাকে নমস্কার, কাল থেকে আর আসবেন না—না তা হয় না—তিনি এখন আর শুধু শিক্ষক নন, পরিবারের বিশেষ বন্ধু। তাছাড়া সত্যিকথা বলতে কী, আমরা সবাই তাঁর অনুপস্থিতিতে যে চঞ্চল হবো, সে কথা ঠিক—অ্যানাতো হবেই। তাছাড়া এই ডুসেলডর্ফ শহরের কথা ও কাহিনী তিনি এমন রসিয়ে রাঙিয়ে জরিয়ে বলেন যে কী মজাই লাগে—ধরোনা—এই জুলিক ও ক্লিভসের জমিদারীর সত্ব সীমানা নিয়ে বা বড়বাজারের ধারে ইলেকটর জন উইলিয়ামের মূর্তির চত্বর নিয়ে যে সব মজাদার গল্প আছে। না, না তোমরা যে তাকে 'মিস্' করবে তাতো বটেই, আমিও। না, এডওআর্ড তুমি যা বলছো, তা অসঙ্গত নয় তোমার দিক্ থেকে তুমি ভালোই বলেছো, কিন্তু যা চলছে চলুক—

এডওআর্ড আর কী করে, মাকে বললে—যা তুমি ভালো বোঝ মা।

বোনকে গিয়ে সেই কথাই বললে সে।

অ্যানা জবাব দিলে—আমি অবশ্য তাই ভেবেছিলাম, মা যা আপত্তি করেছে তাতো অসঙ্গত নয়—কীটন্ যে বেশ মিশুকে আমুদে লোক সে কথা তো সবাই জানে, সে আমাদের আড্ডার প্রাণ, সে কথাও ঠিক। যখন সে একথা বলছিল, তখন এডওআর্ড তার মুখের দিকে চেয়ে দেখছিল—ভাবান্তরটা তার নজরে এসেছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললো—চললুম দিদি—

ফিরে এসে দেখে কেন্ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। দুজনে খানিকক্ষণ মেকলে ও এমার্সন থেকে কিছুটা পড়লে, তারপর ধরলে একটা মার্কিন্ রহস্য-গাথা। তারপর একথা-সেকথা করে তারা

উঠে পড়লো নৈশভোজের জন্য। কেন্‌কে এখন আর আলাদা করে বিশেষ নিমন্ত্রণ করতে হয় না। বাড়ীর লোকের মতই সে হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়াবার পর সে থেকে যায়—এই ব্যবস্থাটাই সে মেনে নিয়েছে। রোজেলী কিন্তু ঐ দিনগুলোতে একটা লজ্জা মিশ্রিত ঔৎসুক্য ও চাপা অস্থিরতা বোধ করতো, পরিচারিকা ব্যারেটের সঙ্গে কী কী মুখরোচক রান্না হবে তাই নিয়ে জল্পনা করতো বা ডিনারের পর বেশ একটু স্বাদু উত্তেজক পানীয় নিয়ে মশগুল হয়ে ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে দিত। কিন্তু মনের গভীরে এক এক সময় প্রশ্ন জাগতো, সে কী কোন অবিবেচনার কাজ করছে—এই বয়সে এই ধরনের প্রেমকল্পনা কী অন্যায়! অবশ্য অনেকসময়ই দেখা যেতো যে একটু দ্রাক্ষারসসিঞ্চিত মদিরা উদরে গেলেই রোজেলী ক্লান্ত ও বেপরোয়া হয়ে উঠতো, ভাবতো তার প্রেমাস্পদের সামনে বসে বসে সে নিজের দুঃখকষ্ট ভোগ করবে, না নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে 'মা ফলেষু কদাচন' বলে চোখের জলে প্রেমের তর্পণ করে বালিশ ভেজাবে।

অক্টোবরের সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের সময় এসে গেলো। কেন্‌-এরও চাহিদা বাড়লো। রোজেলিই শুধু অতিথি সৎকার করে না। পেলফোল স্ট্রীটের ফিংস্টেনরা, চীফ ইঞ্জিনীয়ার রোলওয়াগেনরাও কেন্‌কে ডাকে বড় বড় পার্টিতে। তখন রোজেলীর নিমন্ত্রণ থাকলেও, সে কেন্‌-এর সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলতো না, বরং দূরে দূরে থাকতো। কিন্তু মনে মনে কল্পনা করে কষ্ট পেতো যে ওদের বাড়ীর ও সমাজের যুবতী কন্যারা যেমন লুইসা বা এমিল্লি ওকে নিয়ে বেশ মেতে উঠেছে। সুগঠন সুদর্শন যৌবনশ্রী সম্পন্ন এই মানুষটা ওদের টানবে এটা স্বাভাবিক, তাছাড়া জার্মানজাতির একটু বেপরোয়াভাবে বিদেশীদের প্রতি ঔৎসুক্য ও টান আছে। তাছাড়া কেন্‌-এর জার্মান উচ্চারণের মধ্যে বেশ একটা কৌতুককর ভঙ্গী ছিল। নৈতিক অসঙ্গতি কেউ বোধ করতো না, তাই

রোজেলীর ব্যবহারও তেমন দৃষ্টিকটু দেখাতোনা। সবাই তখন ক্লান্ত মনের লাগাম ছেড়ে দিয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এক একদিন কেউ হয়তো রোজেলীকে বলেই ফেলতো কেন্-এর সামনে —সত্যি, যাহু জানো তুমি রোজেলী, তোমায় কি অপরূপাই দেখাচ্ছে, বিশবছরের মেয়েদের তুমি হার মানালে—আচ্ছা সখি বলো দিকি তোমার ঐ নবযৌবনের উৎসটি কোথায় ?

কেন্ও হয়তো সায় দিয়ে বলতো—আপনি ঠিকই বলেছেন, শ্রীমতী টামলারকে আজ কী মনোরমাই না দেখাচ্ছে—

রোজেলী হেসে ফেলতেন, তার গালদুটি লাল টকটকে হয়ে উঠতো, সবাই ভাবতো এ বুঝি সুমিষ্ট তোষামোদের ফল কিন্তু রোজেলীর মানসে ফুটতো কেন্-এর কমনীয় দুটি সুগোল বাহুর ছবি এবং তার সমস্ত সত্তা যেন এক অব্যক্ত রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো।

এই ধরনের স্নায়বিক মানসিকতা আজকাল তার প্রায়ই ঘটতো যখন সবাই রোজেলীকে বলতো যে দিনেদিনে সে আবার যৌবনবতী হয়ে উঠছে, তাকে কিরকম অল্পবয়সী দেখাচ্ছে—রোজেলীও মনে করতো যে হয়তো সব মেয়েরই ঐ রকম হয়—তারাও অভিজ্ঞা।

এমনি এক সান্ধ্য পার্টির শেষে যখন সবাই বাড়ী ফেরার আয়োজন করছে, তখন রোজেলীর ভাবান্তর হলো যেন তার দেহে ও মনে যৌবনের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে—এই তারুণ্যের পুনরাবির্ভাব, নব অভিষেকের সংবাদ অন্তরঙ্গ কাউকে না বললে নিষ্কৃতি নেই। তার মন চাইছে, শোনাতে জানাতে বোঝাতে যে ঋতুরাজ বসন্ত এসেছেন, অণুতে তনুতে, দেহের প্রতি বল্লরীতে তার অকাল বারতা পাচ্ছে সে—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চেতনায় একটা সুগভীর লজ্জা মিশ্রিত সঙ্কোচও ছিল। প্রকৃতির চাপে তার যে মানসিক পরিবর্তন এসেছে তার কথা কাউকে না বলে

তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না এবং তাঁর যৌবনবতী কন্যাকে একদিন তিনি কথাটা বলেই ফেললেন, তিনি জানতেন যে সে অন্ততঃ এর কদর্থ করবেনা এবং সত্যিকার মূল্য দেবে।

কেন্ অনেককেই আকর্ষণ করতো। তাছাড়া ওর সঙ্গে ইংরেজী বলার একটা মোহও ছিল। তা ছাড়া সাধারণ আদবকায়দা সে মানতোনা—সন্ধ্যার পর চোস্ত ডিনার জ্যাকেট পরার রেওয়াজ যেখানে, সেখানে সে আসতো ঢিলেঢালা একটা সাধারণ লাউঞ্জ সুট পরে। থিয়েটারের বক্সে তাকে দেখা যেতো সাদাসিদে কোট প্যাণ্টে।

এই ফ্যাশনবিমুখতাই তাকে মহিলা মহলে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল, বিশেষ করে যে সব নিপুণারা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে চাইতো। সে অনেককেই ইংরেজী শেখাতো। তাদের বাড়ীতে পার্টিতে ডিনারে আমন্ত্রণও হতো তার ঘন ঘন। ডিনারে বসেও সে অভিজাত আদব কায়দা ভুলে যেত—একখণ্ড মাংস কেটে ছুরিটাকে কেতাদুরস্ত ভাবে না রেখে উল্টে রাখতো কিম্বা যে কাঁটাটা বাঁহাতে ধরা দরকার, সেটাকে ধরতো ডানহাতে। ফলে সবাই মজা দেখতো।

তবে একথা ঠিক যে রোজেলীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা মধুরই ছিল, তাঁকে ভালো লাগতো, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ভালো লাগতো-এটা শুধু টাকার লেন দেন নয়, মনের পরশও। মা কিন্তু মেয়ে অ্যানাকে মনে মনে ভয় করতো, কারণ অ্যানা ছিল শুধু শান্ত মেয়ে নয়, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত, সব জিনিসকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে সে চেষ্টা করতো। সে জানতো যে তার মার মনের মধ্যে স্ত্রীজনোচিত একটা উদার উষ্ণ বিস্তৃতি আছে এবং সেই সূর্যালোকিত কক্ষে কেন্-এর যাতায়াত। এর ফলে এক বর্ষিয়সী মহিলার মনোরাজ্যে কোন বড় রকমের দ্বন্দ্ব আবেগ ঝড়ঝঞ্ঝা আসতে পারে সেটা তার কল্পনাতেই ছিল না, সে ভাবতো, এই ধরনের

সামাজিকতা হচ্ছে স্পর্শকাতর ইউরোপিয়ান মানসের ফল এবং ঔদার্যের লক্ষণ। তা ছাড়া এই সময় রোজেলীর চেহারাতেও একটা নূতন ধরনের চেকনাই ও চাকচিক্য দেখা গেছলো, যাকে বলা যেতে পারে পুনর্যৌবন লাভ—বা তারুণ্যসুলভ দীপ্তি। কথায়বার্তায়, হাবে ভাবে, বদনমণ্ডলের রক্তের উচ্ছাসে তাঁর বয়সোচিত ম্লানিমা ঢেকে যেতো, তিনি হাস্যে পরিহাসে রক্তিম ও চঞ্চল হয়ে উঠতেন।

তখন রাত প্রায় বারোটা, তুষার বৃষ্টিতে গলে যাওয়া ঝরঝর রজনী। মা ও মেয়ে ট্যাক্সীতে করে পার্টি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। রোজেলী কাঁপছিলো। হঠাৎ তিনি বললেন মেয়েকে—তোর গরম ঘরে গিয়ে আধঘণ্টা বসবো, চা খাবো—মনে হচ্ছে শরীরের সব হাড়গুলো কালিয়ে যাচ্ছে, অথচ মাথায় জ্বলছে আগুন—ঘুম শীঘ্র আসবে বলে মনে হচ্ছে না, তাছাড়া বোলেনজারের পানীয়টা ছিল বড় কড়া, শ্যাম্পেন কিন্তু কমলার রস দেয় নি, ফলে নেশাটা বেশ চড়েছে মাথায়, কিন্তু আমার খোঁয়াড়ি ভাঙতেই মাথা ভাঙবে —তোর কিছু হবে না, তুই তো বেশি নিস নি, আমি গল্প করতে করতে গেলাসের পর গেলাস উড়িয়েছি, মনে করছি এই বুঝি প্রথম, তা গরম চা এক কাপ মন্দ হবে না, শরীর একদিকে উত্তেজিত আর একদিকে স্নিগ্ধও হবে, সর্দিকাশীর প্রতিষেধকও বটে। তাছাড়া দেখেছিস তো, বোলেনজারের ঘরগুলো বড় গুমোট অন্তত আমার মনে হয়েছিল, আর কী বিশ্রী আবহাওয়া—মনে হলো বসন্তকাল কী আসবে নাকি? সত্যি, তোর মা বড়ই বোকা, কোথায় ভরা শীতের কুঁকড়ে যাওয়া বরফ পড়া রাত আর আমি কিনা ভাবছি বসন্তের দূত বুঝি এসে গেলো—অবশ্য বেশি দূরে আর নেই—সত্যি অ্যানা, ভাবি শোবার আগে তোর সঙ্গে দুদণ্ড গল্প করলে কেমন হয়—তুই তো আমার বয়স্থা মেয়ে, সব বুঝিস, জানিস—মনের অলিতে গলিতে গোপনে গহনে কতো যে

দুরন্ত রঙীন ভাব-ভাবনা খেলা করে, আনাগোনা করে, সে সব কথা বলতে ইচ্ছে করে তোকে—মন না খুললে কি আর দিল খোলে ?

কি ধরনের কথা তোমার মনে হয় মা—আমার ঘরে কিন্তু ক্রিম নেই—একটু লেবুর রস দিয়েই চা খেতে হবে।

বুঝতে পারছিস না—কী কথা বলতে চাই আমি—ওরে প্রকৃতির সেই দাবির কথা, জীবনের সেই বিচিত্র সর্বশক্তিধর রসের কথা, যা সব কিছু গুলিয়ে দিতে পারে, টলিয়ে দিতে পারে, সব কিছু অজানাকে টেনে আনতে পারে জীবনের রহস্যের অতল থেকে সীমার সীমানায়। তোর তো এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে —সেই যে ব্রুনারের সঙ্গে যখন প্রেমে পড়েছিলি—কষ্টের কথা তো জানি—তখন তুইই তো বলেছিলি এই ধরনের প্রণয় লজ্জাকর যখন দেহের সঙ্গে মনের বিচার বিরোধ হয়।

সত্যি মা, তুমি, মন, হৃদয় এসব কথাগুলো ব্যবহার করো না —এই হৃদয় জিনিসটা নৈবর্তিক—ঠিক কথা বলে না, যদি না ওর পিছনে থাকে বিচার ও বুদ্ধি।

হ্যাঁ, সে কথা সত্যি, তুই বলিস বটে যে প্রকৃতি মেলাতে চায় শুধু দেহকে দেহের সঙ্গে নয়, দেহকে আত্মার সঙ্গে, তবেই সত্যিকার সামঞ্জস্যবোধ গড়ে ওঠে। তোর বেলায় সেই মিলন সুষ্ঠু হয়ে ওঠে নি—তোর বয়সও কম ছিল, তা ছাড়া তুই যে গরবিনী মেয়ে, অভিমানিনী, তোর কাছে প্রেমের আগমন হবে শুধু দেহকে তাতিয়ে মনকে মাতিয়ে নয়, বিচারবিশ্লেষণে সমঞ্জস সমর্থ করেও—তোর কাছে প্রকৃতির দাবির পরিধি তাই বেশি— তোর সঙ্গে আমার অমিল ঐখানে। হৃদয়-সর্বস্ব আমার কাছে হৃদয়টাই বড় এবং প্রকৃতির নিজের হাতে রাঙিয়ে দেওয়া ফলটিকেই নিতে রাজী আছি, থাক না তার অসম্পূর্ণতা বা অসঙ্গতা। তার জন্য আমার লজ্জা হবে না, আমার লজ্জা আমার অপারগতার জন্য।

আমি চাই প্রকৃতির সেই অপূর্ব রসময়তা, তার তন্ময়তা—সেই তো তার মহৎ দান সেইখানেই আমার বশ্যতা—মাথা নত।

মামণি, প্রথমেই বলে রাখি যে তুমি অনর্থক আমাকে প্রশংসা করছো, আমাকে বিচারবুদ্ধি বিশ্লেষণে গরবিনী বলছো। তুমি যাকে কাব্য করে হৃদয় বলছো, তার দাবির কাছে আমি লুটিয়ে পড়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতাম যদি না এক করুণ নিয়তি আমাকে রক্ষা করতো। যদি আমি হৃদয় প্রবৃত্তির টানে ভেসে যেতুম, তাহলে যে কোথায় গিয়ে উঠতাম তা কে জানে। আমি সে কথা বলবো না, তবে আমার কথা তো হচ্ছে না, হচ্ছে তোমার কথা। তুমি যে আমায় এসব কথা বলছো, তার অর্থই হচ্ছে যে তুমি চাও যে আমি শুধু একথাগুলো জানি তা নয়, তোমায় পরামর্শ দিই—বেশ তো, বলো না, তা নাহলে জানবো কি করে—

ওরে অ্যানা, কি বলবি বল দিকিন, যদি বলি যে তোর মাকে এই বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগে ধরেছে, যা তরুণ পরিপক্ক যুবকযুবতীদেরই শোভা পায়, আমার মত বিগতযৌবনা শুঁটকী নারীকে নয়?

যদি আর বলছো কেন মা—এ তো বেশ দেখাই যাচ্ছে যে তুমি প্রেমে পড়েছো।

সত্যিই তাই, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, কেমন সুন্দর ভাবে বললি কথাগুলো—আমার বুক ফাটতো, কিন্তু মুখ ফুটতো না—দুই ওষ্ঠের মধ্যেই চাবীবদ্ধ থাকতো কথাগুলো, আর ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠতো ভাবের ফানুষ, মনে হতো কি লজ্জা, কি আনন্দ—আমি সকলের কাছ থেকেই এই রহস্যটা গুপ্ত রেখেছি, এ যেন আমার স্বপ্ন —এ স্বপ্ন যেন নারীত্বের, মাতৃত্বের মহিমার স্বপ্ন—হ্যাঁ, আমি ভালো বেসেছি, সমস্ত আবেগ, সমস্ত বেদনা দিয়ে ভালোবেসেছি, যেমন যৌবনে তুই একদিন ভালোবেসেছিলি। হয়তো আমার এই চিত্তবিক্ষেপ তোদের বুদ্ধি বিচারের মাপকাঠিতে হেয় হবে, কিন্তু

প্রকৃতি যে আমার সত্তাকে ফুলেফলে পল্লবে শোভিত করে রঙে রঙীন করে দিলেন, আমার যে বেদনায় মূর্তিমতী করে তুললেন। তুই যে ভালোবেসে দুঃখ পেয়েছিলি, তাই তো তোকে এতো কথা বলছি—

মা, মামণি—বলো, বলো আমায়, বলা শক্ত জানি, কিন্তু একটা একটা প্রশ্ন করছি, আস্তে আস্তে বলো, কে সে—?

এমন কিছু অত্যাশ্চর্য নাম নয় যে তোরা বুঝবি না, আমাদের বাড়ির সেই তরুণ বন্ধু—তোর ভাই-এর নবীন মাষ্টার মশায়—কেন্ কীটন্।

অ্যাঁ—

হ্যাঁ,

কেন্ কীটন্, তাই বলো, মাভৈঃ মা, আমি অবশ্য বলবো না যে এটা একটা দুর্বোধ্য কাণ্ড—অবশ্য প্রায় সকলেই একথা বলবে, এবং এটা বলা খুবই সহজ। তারা সহৃদয়তার সঙ্গে বুঝতে চাইবে না যে এই হৃদয়ঘটিত ব্যাপারটির বিস্তার কতটুকু—তুমি অবশ্য বললে বটে যে তোমার বয়সে আর এসব সাজে না—কিন্তু তুমি কি কখনো এই যুবকটির মনের কথা জেনেছো—সে তোমায় চায় কিনা—তোমার উপযুক্ত কিনা—?

উপযুক্ত কি না—এ কী বলছিস্ তুই—আমি ভালবাসি এইটেই কি যথেষ্ট নয়—যতগুলি যুবককে আমি দেখেছি তার মধ্যে মনে হয়েছে কীটন্ই বুঝি এক বিরাট মহিমাময় পুরুষ—

আর সেই জন্যই তুমি তাকে ভালোবাসো? কিন্তু ধরো যদি বদলে যায় কার্যকারণের সম্পর্কটা—নিমিত্ত আর ফল—অর্থাৎ তুমি ভালোবাসো বলেই তাকে শ্রেষ্ঠ মনে করছো।

না, না, ও ভাবে ভাগ করতে যাস নি, যা অবিভাজ্য, আমার কাছে আমার ভালবাসা আর ওর মহিমা এক পর্যায়ের।

কিন্তু তুমি যে দুঃখ পাচ্ছ মামণি, আমি তোমাকে সাহায্য

করতে পারলে খুশীই হই, কিন্তু তুমি ওকে একেবারে ভালোবাসার স্ফীত গৌরবে মহিমান্বিত করে না দেখে সোজা সাদা চোখে দিনের আলোতে দেখো দিকিন, অর্থাৎ তোমার প্রেমের দীপ্ত চশমায় নয়—হ্যাঁ, কীটনের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু ওর ভিতর এমন কী বস্তু দেখলে তুমি যার জন্য শুধু প্রেম নয়, কষ্টও স্বীকার করা যায় ?

তুই হয়তো আমার ভালোর জন্যই বলছিস অ্যানা, আমাকে সাহায্য করতে চাস্, কিন্তু ওর প্রতি অবিচার করিসনি, অনেক সময় দিনের প্রখর আলোয় মনের সত্য ফোটে না, দীপ্ত স্তব্ধ প্রহরও যে ম্লান হয়ে আসে।

তুই বললি যে ও সাধারণ ভাবে আকর্ষণীয় যুবক হতে পারে, তার বেশি ওর কাছ থেকে আশা করা অন্যায়—কিন্তু ভুলিস নি একটা হৃদয় যদি আর একটা হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে তার চেয়ে বড় কিছু নেই— একটা লৌহকঠিন মনোভাব নিয়ে ও কাজ করে চলেছে, এগিয়ে চলেছে, পেয়েছে সম্মান, পেয়েছে স্বীকৃতি, ইতিহাসে অভিজ্ঞ হয়েছে, খেলাধুলোয় প্রথম হয়েছে, দেশের আহ্বানে যুদ্ধ করতে ছুটেছে, সৈনিকের মর্যাদা রেখেছে, সপ্রশংস উল্লেখ পেয়ে সৈন্য দল থেকে ছাড়া পেয়েছে—আর কি চাই –

কিন্তু মা, ভুলো না যে, সৈন্যদলে প্রবেশ করলে, যুদ্ধান্তে সকলেরই এ পরিণাম, যদি কিছু বিশেষভাবে লজ্জাকর বা ক্ষতিকর না করে থাকে তাহলে ঐটুকু সাধারণ প্রশংসা তো সবাই পায়।

সকলেই পায়—ও যে সাধারণের চেয়ে বেশিকিছু নয়, এ কথাটাই বারবার বলতে হবে কেন ? যদি মনে করিস্ যে বক্‌বক্ করেই ওকে আমার মন থেকে তাড়াবি তাহলে ভুল বুঝেছিস্—আমি ওর মধ্যে মহত্ত্ব দেখেছি, ওর মধ্যে জয়শিখার অগ্নিধ্বজা দেখেছি, ওর দেশের জনগণমনের প্রাণময় সত্তাকে দেখেছি।

কিন্তু নিজের দেশকে ওর পছন্দ নয়।

সেইজন্যই আমি মনে করি ও হচ্ছে দেশের সুসন্তান—সব দেশেই ওর ঠাঁই আছে। জানি ও ভালোবাসে ইউরোপকে—তার প্রাচীন রীতি নীতি, তার ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা, তার কথা ও কাহিনী তার গাথা ও গীত ওকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, তাতে তো দোষ নেই, আর সে সাধারণের কাজও নয়। তা ছাড়া ওর দেশের জন্য রক্ত দিয়েছে, প্রাণ পণ করেছিল, প্রত্যেকটি সৈনিককেই সম্মান সহকারেই বিদায় দেওয়া হয়, কিন্তু বীরত্বের পদক পায় কারা—যাদের মন রক্তমুখী নীলার মতন, যারা আঘাত পায় শুধু তারা নয়, যারা আঘাত দিতে পারে তারাও।

মামণি, যুদ্ধ জিনিসটাই এমনি, যে তাতে অনেককেই গিয়ে পড়তে হয়, যোগ দিতে হয়—বীরত্ব আর সাহস থাকুক বা না থাকুক—কারুর হাত পা যদি উড়ে যায় বা কিডনী ফাটে তাহলে একটা মেডেল সে পেলে কি না পেলে যায় আসে না, কিন্তু সাধারণতঃ এতে বীরত্বের কোন আভাস নেই—

যাকগে, সে কথা, কিন্তু আসল সত্যটা হচ্ছে যে সে তার একটি কিডনী উপহার দিয়েছে দেশমাতৃকার বেদীতে।

হ্যাঁ, সে দুরবস্থা তার হয়েছে, তবে তার ভাগ্য ভালো যে একটা কিডনী নিয়েও মানুষের কোনরকমে চলে যায়, কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে এটা দেহের একটা অঙ্গহানি, এবং তার পূর্ণ যৌবনের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে—অর্থাৎ তাকে দেখতে হবে যে সে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়।

ভগবান মাথায় থাকুন—কী বলছিস তুই, কীটন্ পরিপূর্ণ মানুষ নয়? তার মহিমাই তাকে পূর্ণ করেছে—একটা কিডনী থাকলো বা গেলো, তাতে কিছু আসে যায় না—এটা শুধু তার মত নয়, সবাই সে কথা বলে, এমন কি যে সব মহিলারা তার পিছনে ছোটেন এবং যাদের সাহচর্যে তার হাস্যমুখর দিনগুলি কাটে—অ্যানা লক্ষ্মীটি আমার, তোকে কেন এই কথাগুলো বলছি জানিস, তোর

মত চাই, তোর কী মনে হয়, তুই কি সন্দেহ করিস যে কীটন্ জোর প্রেম চালাচ্ছে লুইসা বা এমিলির সঙ্গে—তোর দৃষ্টি গভীরস্পর্শী, তোর বুদ্ধি শক্তিও আছে, তুই শান্ত হয়ে বিচার করতেও পারিস্, তোর কি মনে হয় ?

মামণি, কেন মিছামিছি এসব চিন্তা করছো, কেন নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো বলো দিকিন্, আমার এতো খারাপ লাগে কিন্তু তোমার প্রশ্নের জবাবে বলি যে আমি ওর সম্বন্ধে খুব কমই জানি এবং ওর জন্য আমার এমন মাথাব্যথা হয় নি যে ওর সম্বন্ধে কিছু বিশেষ জানবার উৎসাহ বোধ করবো, তবে আমি কারুর মুখে শুনি নি যে তুমি যে ধরনের ঘনিষ্ঠতার কথা বললে ওর সঙ্গে লুইসার বা এমিলির সে ধরনের সম্পর্ক ঘটেছে, অতএব ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কী ?

লক্ষ্মীরাণী আমার, ভগবান করুন যেন আমাকে ভোলাবার জন্যই এসব কথা বলিস নি, আমার ক্ষতে প্রলেপ দেবার দরকার নেই, কিন্তু দেখ্ তোর কাছ থেকে সহানুভূতি চাইলেও এই লজ্জাজড়িত প্রেমের জন্য আমার একটুও অনুযোগ নেই—আমার যতো কষ্ট দুঃখ বা লজ্জাই হোক্ তার পেছনে আছে আনন্দ, প্রেমের সার্থকতা—সত্যি, মনে করিস নি যে তোর কাছে সহানুভূতির কাঙালিনী আমি—

না, না তা কেন করবে, আমার কাছে সে ভিক্ষার তোমার দরকার কী। কিন্তু সুখ এবং গর্ব এমন জড়িয়ে থাকে জীবনে যে অন্যের একটু সহানুভূতিই আমাদের মনকে সরস করে তোলে বিশেষ যারা আমাদের ভালোবাসে অন্তত যদি এই মূঢ় মোহ থেকে অব্যাহতি পেতে হয়। ক্ষমা করো আমায়—আমার কথায় কিছু মনে করো না, কিন্তু আমার কাছে আমার কথার চেয়ে তুমিই বেশি মূল্যবান। তুমি আমায় তোমার মনের কথা বলেছো, তুমি এতদিন তোমার হৃদয় দুয়ারে এই রহস্যটিকে চাবী দিয়ে রেখেছিলে, কিন্তু একথা বোঝাই যাচ্ছিল যে এই কয়মাস ধরে তোমার মনের মধ্যে

কী যেন একটা তোলপাড় করছিল, কোথায় যেন একটা গুপ্ত কথা আছে। তোমার মধ্যে এই যে সংঘাত—এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিলো—তুমি যাদের ভালবাসো তাদের কথা ভাবছিলে।

এ সম্পর্কে কাকে তুই, 'তাদের' বলছিস্ ?

আমি আমার কথাই বলছি—দেখছোনা এই ক সপ্তাহ কী রকম বদলেছো তুমি—যেন এক নতুন যৌবনের ধারা এসে তোমাকে অভিষিক্ত করেছে। না, ঠিক সে কথাও বলা যায় না। কথাটা কি জানো—মাঝে মাঝে মনে হয় আমার, যেন তোমার ঐ মাতৃমূর্তির খোলস ছেড়ে বিশবছরকে পিছনে ফেলে তুমি এসে দাঁড়িয়েছো। যখন আমি ছোট্ট মেয়েটি ছিলাম—আর মনে হয় যখন তুমি নিজে ছোট্ট ছিলে তখন কী রকম দেখতে ছিলে। এক এক সময় মনে হতো এ তো বেশ ভালো, যুবতী মেয়ের নবীনা মা—কিন্তু তারপরেই মনটা খারাপ হয়ে যেতো, কেননা আমি জানি যে এতে ভালো হয় না—দেহের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য না থাকলে সব দিক রক্ষা হয় না—এ যেন রক্তমুখী বেদনার উৎসমুখ খুলে দিতে নতুন করে পুষ্পিত হওয়া।

তুমি ঠিকই বলেছো মা—এ পুনর্যৌবন লাভ বেদনার কষ্টের, তিতিক্ষার—তুমি একটি সরল মনের মানুষ, তুমি একটা নিরর্থক উচ্ছাসে কষ্ট পাবে ভালো লাগবে না। তুমি বেশি পড়ো নি, কবিদের ভাষা জানো না, কিন্তু সৃষ্টি করছো কবিত্ব, এ যেন বেদনায় রাঙা—

কিসের—বল্ অ্যানা বল্—কবিরা যদি এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে দোষ কী—তাদের করতে হয়, তারা বোঝে, তারা জানে, এবং প্রকৃতির নিয়মে আপনি যে সব কথা বেরিয়ে আসে তাদের লেখনীতে, ভাষা বাঙ্ময় হয়—রূপ নেয় প্রয়োজনে—কিন্তু যাকে তুই মোহ মরীচিকা বলছিস্ সে হচ্ছে ওরই যৌবনের কাজ—রূপ থেকে প্রতিরূপ। আমার প্রাচীন সত্তা চেয়েছিল

ওর নবীন সত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে, যাতে আমাকে লজ্জায় অপমানে সবার নীচে সবার পিছে না পড়তে হয়।

অ্যানা এবার কেঁদে ফেললে। মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনের চোখের জল এক সঙ্গে মিললো। খঞ্জ মেয়েটি গভীর দ্যোতনার সঙ্গে বলবার চেষ্টা করে—মা, ঐ যে কথাগুলো বললে, ঐ যে বাক্যগুলো বেরুলো তোমার মুখ থেকে, জানো, ওগুলো বিনাশের বাণী। তোমাকে যেন নিশিতে পেয়েছে, তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, নষ্ট করছে। না, আমরা তা হতে দেবো না—তোমাকে তোমার কাছ থেকে সর্বনাশের পথ থেকে টেনে আনাই আমাদের কাজ। জানো মা, তুমি ভুলে গেছো যা তোমার দৃষ্টির বাইরে। যা দরকার সেটা হচ্ছে একটা বিচার বিবেচনা করে মূল সিদ্ধান্তে আসা। না, এ ছোকরা মানুষটিকে আর আমরা আসতে দেবো না। ওর আর এখানে পড়ানোর দরকার নেই। না, এ বাড়িতে না এলেও হয়তো অন্যত্র দেখা হবে তোমাদের। আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো যে এই শহর ত্যাগ করে ও চলে যাবে। অনেকদিন ডুসেলডর্ফে থেকেছো, আর দরকার কী, অনেক জয় হয়েছে আর নয়। যাক্ সে হ্যামবুর্গ, মিউনিখ্, বার্লিনে—জার্মানী বহু বিস্তৃত, ডুসেলডর্ফ ই তার সীমানা নয়। তা ছাড়া নিজের দেশ আছে তার। আর সে যদি সত্যিই না যেতে চায়, আমরাই ডুসেলডর্ফ ত্যাগ করবো—কলোনে যাবো, কিম্বা ফ্র্যাঙ্কফোর্টে। দরকার হচ্ছে ওকে এখন চোখের বাইরে রাখা—এই হচ্ছে একেবারে বিশল্যকরণী ওষুধ—তুমি বলবে হয়তো যে মন হয়তো শুনবে না—জানি ভুলে যাওয়া ভালো নয়—কিন্তু 'টনাসে' চলো দেখবে প্রকৃতিদেবী তোমার চোখের অভাব পুরিয়ে দেবে—শূন্যমন পূর্ণ হবে।

অ্যানা মাকে বোঝালে বটে কিন্তু কাজের হলো না কিছুই। সব বক্তৃতাই ভস্মে ঘি ঢালা হলো।

থাম্ থাম্ অ্যানা—আর নয়—আমি ওসব কথা শুনতে চাই না

মোটেই—তুই আমার দুঃখ বুঝছিস্ কাঁদছিস্ বটে কিন্তু তোর প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না—আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো, কেন? আমার জন্য করুণা এতোই বেশি যে আমার মনে প্রকৃতি যে প্রেম চেতনা রোপণ করলেন তার জন্য পালাতে হবে—এতো অকৃতজ্ঞ আমরা, এতো বিদ্রোহী কেন—জানিস না সারা কি করেছিল—বলেছিল—আমি যখন বৃদ্ধ হব, তখন তুমিও বৃদ্ধ হবে, স্বামী এবং আব্রাহামের বয়স তখন নিরেনব্বই—এবং সেই বয়সের স্বামীর সঙ্গে রতিরণে দীক্ষা দেহ গুরু বলা সাজে কোন নারীর, যদিও পুরুষের প্রেমজীবন নারীর যৌনজীবনের মত বয়সের দ্বারা নির্ধারিত ভাবে সীমিত হয় না। অ্যানা আমার রক্তে তুফান বইছে, আমার শরীরে কামনা ফণা তুলছে—হোক্ তা লজ্জার, হোক্ তা দুঃখের—আমি সেই রসাশ্রয়কে ছাড়বো না—আমি পালাবো না আর তুই যদি ওকে তাড়াস্ তো মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তোকে আমি ঘৃণা করবো।

অত্যন্ত দুঃখ ও গভীর ক্ষোভের সঙ্গেই অ্যানা তার মার এই সব অসংযত ও অশোভন কথাগুলো শুনলে, তারপর বেদনা-চিহ্নিত কণ্ঠে বললে—মামণি, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছো, তোমার এখন দরকার বিশ্রাম ও ঘুম—তুমি বিশ কি পঁচিশ ফোঁটা ভ্যালে-রিয়ান্ খেয়ে ফেলো, এতে অনিষ্টকর কিছু নেই, অথচ তোমার মানসিক স্থৈর্য এনে দিতে সাহায্য করবে। এবং এটা স্থির জেনো, তোমার পছন্দ হয় না এমন কোনো কাজ আমি করবো না। আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি, তুমি শান্তি ফিরে পাও এই আমার একান্ত কামনা। আমি যদি কীটনের সম্বন্ধে কিছু বলে থাকি মনে রেখো তোমার জন্যই আমি তার কথা বলেছি, তোমার ভালোবাসার পাত্র যদি সে হয় তাহলে আমার দিকে তার কিছু অনাদর হবে না, তবে তার জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে, এটা আমার পছন্দ নয়, কোনো মেয়েই চায় না যে তার মার মনের শান্তি নষ্ট করুক কোন বাইরের লোক—আমার অভিসম্পাত সেইজন্যে।

তুমি যে আমাকে সব কথা খুলে বলতে পেরেছো, এর জন্য আমি তোমার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এতে তোমার মন হাল্কা হতে পেরেছে আশা করছি। তোমার ঐ সুন্দর সুখী মন যা আমাদের সকলের জন্য কতো ভালোবাসা বয়ে নিয়ে চলেছে, তার কী তুলনা আছে—ভালোবাসা মানেই দুঃখ—এই দেখো না……(অ্যানা তার মাকে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো, যাতে সে নিজেই তাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে পারে) ভালোবাসার মধ্যে কত রকমের ভাব যে আছে এবং ভালোবাসা জিনিসটার কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—ধরো মায়ের ভালোবাসা ছেলের জন্য—আমি জানি এডওআর্ড তোমার ধারকাছে বেশি ঘেঁসে না—কিন্তু কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা তো হয় না। অবশ্য ধরো যদি কেন্ তোমার ছেলেই হতো, তাহলে এই ভালোবাসাটা শুধু আরো মধুর হতো না, চিরস্থায়ী হতো। মাতৃস্নেহের তুলনা হয় ?

রোজেলী চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেললে, বললে—তাহলেই বোধ হয় আত্মার ও দেহের সঙ্গত আত্মীয়তা স্থাপন করা যায়, না ? কিছু মনে করিস নি মা, তোর বুদ্ধির উপর আমার আস্থা যে অনেক, তোকে কতো খাটাই—কিন্তু তোকে মিথ্যেই খাটাই, আমার এটা অন্যায়—সেই টনাসে যাবার মতো আর কী—হয়তো তোকে আমার কথাগুলো স্পষ্ট বোঝাতে পারবো না—শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, তোকে ভারী মিষ্টি লাগছে, বহু ধন্যবাদ। কেন্‌কে শুধু আমার জন্যে তুই শ্রদ্ধা করতে পারবি সে কথার জন্যেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাকে অন্ততঃ ঘৃণা করবি না এইটুকুই করিস, আর তাকে তাড়িয়ে দিস নি—ও কী জানিস—আমার সত্তায় ওর মধ্য দিয়েই প্রকৃতি যাদুকরী হলেন।

অ্যানা চলে এলো। এক সপ্তাহ কেটে গেলো, এর মধ্যে দুরাত্রি কীটন্ ওদের বাড়িতে রাত্রিভোজ খেলে। প্রথমবার ডুইবার্গের এক দম্পতী ছিলেন, তারা রোজেলীর আত্মীয়—মহিলাটি ওরই সম্পর্কে

ভগিনীস্থানীয়া। ভাবাবেগের মাঝে মনের ছবি যে মুখের উপর ছায়া ফেলে, তার কোন লক্ষণ ঐ দুই নিমন্ত্রিতরা পেয়েছেন কিনা অ্যানা সেইটেই দেখছিল। দু-একবার মহিলাটি কীটন্ ও গৃহকর্ত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। একবার তার স্বামীর গোঁফের নীচে একটু হাস্যরেখাও যেন দেখতে পেয়েছিলেন।

কীটনের ব্যবহারেও বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল অ্যানা। তার মা যে সব সময়ই ওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলেন তা নয়, কিন্তু কেনের দিক থেকে রোজেলীর মনোযোগ আকর্ষণ করবার দিকে কোন কার্পণ্য ছিল না। এমন কি রোজেলী মেয়ের পরামর্শ সম্পর্কে ঠাট্টা করতেও ছাড়লেন না। ব্যাপারটা হলো এই যে কেন্ আগের রাত্রে শহরের এক পানশালা থেকে আর এক পানশালায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে দিব্যি আড্ডা দিয়ে বেড়িয়েছেন ভোর সকাল পর্যন্ত—সঙ্গে ছিল আর্ট স্কুলের একজন ছাত্র আর শিল্পপতিদের দুজন ছেলে—ফলে টামলারদের বাড়ি যখন এলেন তখনও নেশার জের কাটে নি। এডওআর্ডই ফাঁসিয়ে দিলে কথাটা। খাওয়াদাওয়ার শেষে যখন সবাই শুভরাত্রি বলে চলে যাচ্ছে তখন রোজেলী তার কন্যার দিকে চেয়ে ওর কানটা ধরে বললেন—শোনো হে ছোকরা, রোজেলী মায়ের কথা, ভদ্রমহিলাদের বাড়ি আসতে গেলে একটু ভদ্র হয়ে আসতে হয়—ভদ্র আচরণ করতে হয়—চোখটা খোলা রাখতে হয়—না শুধু বিয়ারের পর বিয়ারই চলবে দিনরাত—যদি বন্ধুবান্ধব জোটে, তবে সে সব খারাপ ছেলেদের ত্যাগ করলেই হয়, আশা করি এসব বদ্ স্বভাব ছাড়বে। যখন রোজেলী কথা বলছিল, তখন তার দৃষ্টি ছিল অ্যানার দিকে। সেও কানটা বাড়িয়ে দিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল—এ তো বড় শাস্তি, বড্ড লাগছে যে। ওর মুখটা প্রায় রোজেলীর মুখের কাছে এসে পড়েছিল। রোজেলীর বক্তৃতা তখনও শেষ হয় নি,—শুনছো খারাপ ছেলে, বেশি যদি বদমায়েসী করো, তাহলে তোমায় দেবো এই শহর থেকে নির্বাসিত

করে। টনাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে বসে দণ্ড ভোগ করতে হবে। কোন দাপাদাপি নয়, কোন প্রলোভন নয়, সেখানে বসে কৃষকদের ছেলেদের ইংরাজী শেখাবে। তারপর কানটা ছেড়ে দিয়ে. মুখটা সরিয়ে নিয়ে অ্যানার দিকে একটু কুটিল দৃষ্টিপাত করে রোজেলী চলে গেলেন।

এক সপ্তাহ পরে আর একটা কাণ্ড ঘটলো যেটাকে কিছুটা অসাধারণ বলা যায়। অন্ততঃ অ্যানাকে সেটা শুধু আশ্চর্যই করে নি, বেশ স্পর্শকাতর ও বিচলিত করেছিল এবং ভাবিয়ে তুলেছিল তার মার জন্যে। সকাল দশটার সময় ঝি এসে খবর দিলে যে তার মা তাকে শয়নকক্ষেই দেখা করতে বলেছেন। সকালে প্রাতরাশের ব্যবস্থা ছিল যে এডওআর্ড খেতো আগে, তারপরে অ্যানা, তারপর গৃহকর্ত্রী। সেদিন রোজেলী তার ঘরে তখনও আরাম কেদারায় শুয়ে, একটি পাতলা কাশ্মীরী শাল মুড়ি দিয়ে। তার নাকের ডগাটা রক্তাভ দেখা যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে তাঁর অবসাদটা একটু চেষ্টাকৃত। রোজেলী কিছু বলছেন না দেখে অ্যানাই জিজ্ঞেস করলে—মা, কী ব্যাপার, তোমার শরীর খারাপ নয় তো? আরে না, না, বেশি ভীত হবার দরকার নেই, আমি ভাবছিলাম নিজেই তোর ঘরে গিয়ে সম্ভাষণ জানিয়ে আসবো, কিন্তু না, মনে হলো, কেউ এসে আমায় একটু আদর সোহাগ করুক, মেয়েদের ওটা মাঝে মাঝে দরকার হয়।

মা, কি বলছো তুমি?

রোজেলী তখন হঠাৎ উঠে বসে অ্যানাকে কাছে টেনে তার কণ্ঠ জড়িয়ে, গালে গাল ঘষে আনন্দের সঙ্গে বললেন চুপিচুপি কানে কানে, জয় অ্যানা, জয়, যৌবন ফিরে এসেছে এতদিন পরে, যেমন আসা উচিত প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে একজন সক্ষম সবল স্ত্রীলোকের। প্রকৃতি নিজে হাতে আমাকে রক্ততিলক পরিয়েছেন, যা তিনি বয়সের দোষে কেড়ে নিয়েছিলেন, আজ আবার তিনি তা

ফিরিয়ে দিয়েছেন। তুই বলেছিলি না যে দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য থাকা চাই—প্রকৃতি সেই সামঞ্জস্য ফিরিয়ে দিয়েছেন আমায়—আমার মন আমার আত্মা জয়ী হয়েছে দেহের উপর। আমি আবার নারীত্ব পেয়েছি—আমাকে অভিনন্দিত কর। আমার রমণীত্ব জয়ধ্বজা তুলেছে, একজন পুরুষের যৌবনের পরশ আমাকে আবার নারী করেছে—সৃষ্টি হবে জায়মানা—আর আমার কোন হীনতার ক্ষোভ নেই। আমি আনন্দিত, আমাকে চুমু খা, প্রকৃতিকে ধন্যবাদ দে—

এই কথা বলে রোজেলী একেবারে নুইয়ে পড়লো, চোখ বুজে, আনন্দে মেতে রইলো।

অ্যানা মনে মনে অসুস্থ বোধ করলেও, বললে—মামণি, এ তো বেশ ভালোই, তোমার সত্তার শুধু গভীরতাই প্রমাণিত হলো না, তার সম্পন্নতাও, যাতে করে প্রকৃতি দেহকে কাজ করিয়ে নেন মনের সঙ্গে সমান অন্তরালে। ভেবো না আগে যে সব কড়া কড়া কথা বলেছি, তাতে আমি বিশ্বাস করি না যে দেহের উপর মনের প্রতিক্রিয়া নেই। দেহ আর মন অঙ্গাঙ্গী এবং তাদের যৌথ মিলনেই সুখ। শুধু দেহই মনের উপর, আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করে না, সেই ভিতরকার সত্তাও দেহের উপর জোর খাটায়। তাকে যাদুই বলা যেতে পারে। কিন্তু মা, এই ধরনের পরিবর্তন আমার মনে কিন্তু বেশি উৎসাহ আনে না, এবং তোমার মনে যে উৎসাহ বা উদ্দীপনা জাগিয়েছে, আমার মনে তা করে নি, আমি তোমার ঐ প্রকৃতিকেও বেশি খাতির করছি না। অবশ্য আমার নিজের বয়স হয়েছে, আমার পা খোঁড়া, আমার বিয়ে হয় নি, আইবুড়ো ধাড়ী আমি দেহের জগতে কি ঘটলো, তাকে ততটা আমল দিতে অভ্যস্ত নই। তোমার মানসিক স্বচ্ছতাই আমার কাছে বেশি প্রার্থনীয় ও লোভনীয় মনে হয়, যতোই না কেন তোমার দেহ তার যৌবনোচিত ব্যবহার পুনরায় করুক না কেন ?

না, না তুই আর বেশি বকিসনি, এখন যাকে মানসিক সতেজতা

বলছিস্ ক'দিন আগেই সেটিকে মূর্খতা বলে নিন্দা করেছিলি এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছিলি যে আর আমার এইরূপ বর্ষীয়সী মাতৃজনোচিত ব্যবহার ছাড়া উপায় নেই, রীতি ও নীতিও তা নয়—আচ্ছা, এখন কী মনে হয় না যে এই ধরনের উপদেশ আরো কিছুদিন স্থগিত রাখলে চলতো? প্রকৃতি আমার অন্তরের কথা শুনেছেন এবং স্পষ্ট দেখিয়ে দিলেন যে আমার যৌবনোচিত ব্যবহারে কোন দোষ নেই, এবং যে সবল তারুণ্য আমায় নতুন করে জাগিয়েছে তার প্রতি লোভেও কোন লজ্জা নেই। সত্যিই কি তুই বলতে চাস্ যে আমার দেহের কোষে এটা কোন পরিবর্তনের সূচনা করে না?

ওগো মা, তুমি কেন বুঝছো না যে তোমার প্রকৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অটুট, তাঁর বারতা যদি আবার এসে থাকে তুমি শোনো—তোমার আনন্দ, তোমার নব অনুভূতি তোমার থাক্, সে কথা ভেবো না অন্ততঃ আমার পক্ষে। আমি তোমায় উপদেশ দিয়েছিলাম যে অন্তরঙ্গে তুমি যতই চেষ্টা করে নিজেকে বদলে নাও না কেন, বহিরঙ্গে বিশেষ কোন তফাৎ হবে না—তুমি যদি কীটনকে ভালোই বাসো, ছেলের মত বাসলে ক্ষতি কি—অবশ্য আমাদের নবীন বন্ধুটির জন্য আমার মন শীতল নয়—যদি তা মনে করো তো ক্ষমা করো—আমি ভাবছিলাম তুমি কি মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করতে পারো না—আমার ছিল সেই আশা। সেটা তো উল্টে যায় নি এবং তোমাদের দুজনের সম্পর্কের ধারা কোন গতি নেবে সেটা শুধু তোমার উপর নয়, ওর উপরও নির্ভর করে—

হ্যাঁ, ওর উপরও নির্ভর করে বই কি—তুই যখন দুপক্ষের কথাই মনে করেছিস, সে কথা তো ঠিকই, তবে তোর ভাবটা হচ্ছে যে ও আমাকে ছেলের মতই ভালোবাসতে চায়?

আমি তা বলতে চাই না, মামণি।

তা বলবিই বা কিরকম করে বল? তোর তো সে অধিকার জন্মায়নি—প্রেমের ঘটকালীতে, তুই তো শিশু, তোর কোন জ্ঞানই

নেই, সে সর্বপ্লাবী উচ্ছ্বাসটা কি ঘটাতে পারে—তুই তো একবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েই ও রাস্তাতেই ঘেঁসলি না ? অবশ্য দেহপ্রকৃতি তোকে ছেড়ে দিয়েছে বোধিপ্রকৃতির কাছে, তাই প্রেমের পাঠ নিতে হলে তোর কাছে নেবো না ? তুই আমায় নৈরাশ্যের গভীর নৈরাশ্যে ফেলবি ? তাই না ? তোর যদি দেখবার ক্ষমতা থাকতো তাহলে দেখতিস যে ও তৈয়ারী পাকা ফলটির মত হয়ে আছে, একবার সাড়া পেলেই উত্তর দেবে। তুই কি ভাবিস ও আমার সঙ্গে খেলা করছে—এতোটা পাষাণ নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হবে—তোর অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু জানিস না যে অনেক সময় তরুণরা অভিজ্ঞতাসম্পন্না বর্ষীয়সীদেরই পছন্দ করে বেশি—একটা অভিজ্ঞতাহীনা বালিকা তো একটা বোকা রাজহংসীর মত। অবশ্য হয়তো বর্ষীয়সীদের মনে তরুণদের জন্য একটা মাতৃসুলভ স্নেহ ও ভালোবাসার স্থান থাকতে পারে—তাতে কী হয়েছে—তুই তো সেদিন সে কথা বলছিলি ? না ?

হ্যাঁ মা, তুমি ঠিকই বলেছো—ও বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোন মতদ্বৈধ নেই—

তাহলে তুই আমায় বলিস নি যে আমার আর আশা নেই, বিশেষ করে আজ, যখন প্রকৃতি আবার আমায় তার ঋতুচক্রের তরঙ্গ দোলে দোলাচ্ছেন—হ্যাঁ আমার চুল কালো হয় নি বটে, শ্বেতশুভ্র—যা তুই চেয়ে দেখছিস—তাতে কী হয়েছে—হয়তো দেখবি একদিন প্রকৃতি নিজ হাতে আমার মল্লিকাফুলের মালার মত মাথার উপরে কৃষ্ণ কলপ লাগাচ্ছেন। সত্যি ভুল করেছি, যখন চুল পাকতে আরম্ভ করলো, তখনই যদি কলপ ধরতাম, হঠাৎ এখন চুলে রং লাগিয়ে ভ্রমরকৃষ্ণ করলে লোকে বলবে কী ? কিন্তু তাতেও দোষ নেই, প্রকৃতিই আমাকে নিজ হাতে সে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু মুখটাকে একটু ঘষে মেজে পালিশ বা ম্যাসেজ করতে দোষ নেই বোধ হয়, অন্ততঃ রুজ লাগালেও চলে—এটা তো প্রকৃতিকে সাহায্য করা—তোদের কী মত ? তোরা কী কিছু মনে করবি।

না, তাতে আর ক্ষতি কি—এডওআর্ড তো দেখবেই না, যদি তুমি একটু বুঝেসুঝে মাখো আর আমি যদিও মনে করি কৃত্রিমতার কিছুই ভালো নয় তবু এটুকুন করা কিছু পাপ নয়, আর এতো চল্‌তি ফ্যাশন্।

তাহলে তোর আপত্তি নেই? যতই বল না কেন. কেনের মনে ঐ মাতৃসুলভ ভাবটা বেশি পাকাপোক্ত হয়ে না বসলেই ভালো—তাতে আমার আশাভঙ্গ হবে। জানলি, সোনা মেয়ে, তুই তো হৃদয়ের কথা বললে বিরক্ত হোস্ কিন্তু আমার হৃদয় একেবারে যৌবন জোয়ারে ফুলে উঠেছে। গর্বের ও আনন্দের জলতরঙ্গে তুলছে। মনে হচ্ছে ওর তারুণ্যকে আমি কি দিয়ে বরণ করে নেবো, কী আত্মবিশ্বাস উপহার দেবো—তোর মায়ের জীবন যমুনায় বান ডেকেছে?

সত্যি তোমার আনন্দে কী ভালোই লাগছে মা?

তোমার সুখচিন্তার অংশীদার করে নিয়েছো আমায়, এর চেয়ে মধুর আর কিছু নেই, কিন্তু তবু কেন যে একটা উৎকণ্ঠা আমায় ঘিরেছে—হয়তো এটা আমার শুচিবায়ুগ্রস্ততা, কিন্তু মনে হচ্ছে এটা শুধু ভাবালুতা নয়, সত্যিকারেরই উদ্বেগ। তুমি বলছো বটে মা যে তোমার আশা, তোমার প্রকৃতি তোমায় নতুন করে ভালোবাসার ক্ষমতা দিয়েছে, হতে পারে তাই, কিন্তু আমার মতে—তোমার নিজের প্রেমময় সত্তাই তোমায় এই আশা দিয়েছে—যদি আরো পরিষ্কার করে এ কথাটা সত্যি জানতে পারতাম। যদি জীবনের নিখুঁত তথ্যটিকে ধরতে পারতাম তাহলে আমার এতটা ভয় হতো না। তুমি কি আবার বিয়ে করতে চাও মা? কেন্ কীটনকে আমাদের পিতৃপদে অভিষিক্ত করতে চাও? তাকে সঙ্গে নিয়ে গীর্জ্জায় দাঁড়াতে চাও—আমার বলা উচিত নয়, কিন্তু বলতে হচ্ছে যে তোমার ও তার বয়সের যা তফাৎ তাতে মাতাপুত্রের সম্পর্কটাই দেখতে ভালো হতো এবং এতে লোকে একটা আশ্চর্য হবারই ছুতো খুঁজে পাবে?

শ্রীমতী টামলার মেয়ের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন না,—তা হতে পারে না, আমি সে কথা ভাবিও নি—কিন্তু শোন্ অ্যানা, তুই কি ভাবছিস্ বোকা মেয়ে যে আমি তোর ও এডওআর্ডের মাথার উপরে এক চব্বিশ বছরের ছেলেকে বাপ বলে চাপিয়ে দেব, না, না তা হয় না। সত্যি তুই যেন কী, গম্ভীর ভাবে বলছিস্ যে গির্জ্জায় গিয়ে বেদীর সামনে যুগলে দাঁড়াবো ?

অ্যানা চুপ করে গেলো। তার চক্ষুপল্লব কিছুক্ষণের জন্য অবনমিত হলো, সে মার চোখ এড়িয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রইলো।

তার মা বলে যেতে লাগলেন—আশা—কাকে তুই আশা বলিস, এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারিস ? কেমন করে আমি বলবো যে সাধারণ জীবনে এটা কি কাজে লাগবে। প্রকৃতি যে জিনিস আমায় দিয়েছেন সেটা এতো সুন্দর যে আমি তার পরিবর্তে এক সুন্দরেরই সাধনা করতে পারি, কিন্তু কিভাবে কোন দিকে সেই মহতের বৃহতের আবির্ভাব হবে তা জানি না, ভাবিও নি। তাছাড়া তার ফল কি হবে তাও চিন্তা করি নি। আশা একেই বলে—সেখানে অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, এর মানে এই নয় যে আমাকে বেদীর ধারে গিয়ে বিয়ের শপথ নিতে হবে—

অ্যানা তার ওষ্ঠ দুটো চেপে আস্তে আস্তে বলে ফেললে—সেই ভালো মা—সেই ভালো—

শ্রীমতী টামলার তাঁর অঙ্গহীনা মেয়ের দিকে অভিভূত হয়ে চেয়ে রইলেন, সে মুখ নীচু করে ছিল—এবং তার মনের নিজস্ব কথাটা যে কী সেইটে ধরতে চাইছিলেন।

অ্যানা—তিনি বললেন মৃদুভাবে—এ কী করছিস, কী ভাবছিস, তোকে যে বুঝতেই পারছি না—ব্যাপার কী—তুই শিল্পী না আমি। আমি ভাবতেই পারি নি যে আমার শিল্পরসিকা মেয়ে তার মনের ঔদার্যে সেকেলে মায়ের চেয়ে ঢের নীচে পড়ে থাকবে, তার ব্যবহার, কায়দাকানুন এতোটা ছোট হবে। তুই না শিল্পী—তোর

মনের সেই উদারতা গেলো কোথায়—তুই কী সেকেলে পুরনো দিনে ফিরে গেলি—সেই বস্তা পচা সমাজের হাবভাব রীতিনীতি আদর্শে। এখন আমরা স্বাধীন গণতন্ত্ররাষ্ট্রে বাস করি, নতুন নতুন ও নানা আদর্শ ও ভাবের বন্যা আসছে—এখন মনও ছাড়া পেয়েছে—তাদেরও আদর্শ বদলাচ্ছে—দেখ না আজ কাল ছেলেরা কী আর পকেটে রুমাল একটু খানি গুঁজে বেড়ায়—সে দিন গেছে—মনও উথলে উঠছে, রুমাল ও পকেট থেকে উথলে পড়ছে, এই তো এডোয়ার্ডকেই দেখনা—আমি ত এতে আপত্তি দেখি না, বরং সন্তুষ্ট—

মা মণি, তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর—রুমালের উপমা যেটা দিলে সেটা একটা প্রতীক—ওটাকে অতোটা ব্যক্তিগত করে না দেখলেও চলে। তুমি তো নিজেই বলো যে সে তার বাপের মতই গড়ে উঠেছে—অর্থাৎ আমাদের লেঃ কর্ণেল পিতৃদেবের মত। অবশ্য বাবার কথা না বলাই বোধহয় সুরুচিসঙ্গত, তবু......

অ্যানা তোর বাবা একজন বিশ্বস্ত ও কর্মঠ সরকারী কর্মচারি ছিলেন, এবং সম্মানের সঙ্গেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু প্রেমিকসজ্জন হিসাবে তিনি খুব সুজন ছিলেন তা বলতে পারবো না। মেয়েদের পিছনে ছুটতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ এবং লাম্পট্যে ডনজুয়ানেরই দোসর, তাঁর কীর্তি কলাপ দেখে ও শুনে আমাকে অনেক সময়ই দুচোখ বুজে থাকতে হতো,—তাই এখন যদি তাঁর নাম করিস্ এটা একেবারে অসঙ্গত হবে না ?

বেশ তো মা, তাঁর স্ত্রীলোকঘটিত দোষ যতই থাক্, তিনি ছিলেন একজন মানী লোক—তাঁর জীবনে কতকগুলো আদর্শ ছিল, এবং এডওআর্ড তার কিছু কিছু যে পেয়েছে এটাও ঠিক। তার ভাবভঙ্গী বা চেহারাই শুধু বাপের মত নয়, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার মানসিক প্রতিক্রিয়াও অনেকটা সেই ধরনের হবে। কি বলতে চাস্ তুই, কী ঘটনা হলে কী হবে।

মা, সোজাসুজি কথা বলাই ভালো—তোমাতে আমাতে বরাবরই

বান্ধবীর মত ব্যবহার করেছি। তোমার সঙ্গে ও যদি কিছু এমন সম্পর্কই ঘটে যা নিয়ে লোকসমাজে কিছু কথা ওঠে তাহলে সেটা কী অজানা থাকবে। তুমি নিজে একটা আমুদে লোক, তোমার স্বভাবে আছে একটা নির্মল স্বচ্ছতা, তাতে তুমি তোমার মনের গভীর গুপ্ত কথাগুলি লুকিয়ে রাখতে পারবে? ধরো কেউ যদি ঠাট্টা করে এডওআর্ডকে বলে যে তোমার মা ঠাকরুণ প্রেমসাগরে হাবুডুবু দিচ্ছেন; ডুবেডুবে জল খাচ্ছেন, সে হয়তো তাকে কানে ঘুষি মেরেই বসবে, তার পর তারও কী ঘটবে কে জানে—

থাম্ থাম অ্যানা, এ সব কী ভাবছিস—তুই বড় পেচাঁলো—জানি তুই আমার ভালর জন্যই বলছিস্ কিন্তু তোর মাকে শুধু শুধুই অপরাধী করছিস্—

রোজেলী কেঁদে ফেললেন। অ্যানা তাকে শান্ত করে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলে।

মামণি, আমায় ক্ষমা করো—তোমায় কী আঘাত দিতে পারি—আমার মন ফেটে যাচ্ছে এই সব কথা বলতে—তোমারই সন্তান তো আমরা—তোমার যাতে সুখ, যাতে শান্তি, তোমার যা ভালো লাগে, তাতে আমরা কথা কইতে যাবো কেন—জানো এডওআর্ডের কথা বললুম—কারণ সে তো সাধারণতন্ত্রী এখন, তার রুমাল সেই ধ্বজাই ওড়ায়—আমরা কী বলি বা লোকে কি বলে, সেইটেই মুখ্যকথা নয়—মন কী বলে। এই যে বললে তুমি উদার—ধরো না বাবার কথাই—তিনি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁর ধ্যান ধারণা আদর্শও কয়েকটা ছিল তবু তিনি দাম্পত্য অনাচার করতে কুণ্ঠিত হন নি—কারণ তিনি হয়তো ভাবতেন লাম্পট্যের সঙ্গে জীবনের অন্য নীতির কোন সম্পর্ক নেই—অথচ অন্য স্ত্রীসম্পর্কে তার অনাসক্তি ছিল না এবং তুমি নিজেই সেটাকে মেনে নিয়েছিলে—অর্থাৎ তিনি মনে প্রাণে লম্পট ছিলেন না—সেই রকম তুমিও নও—আমি শিল্পী, ঐ জীবন বোধের দিক থেকেই

কথাটা বলছি—আমরা রেখা টেনে, এ লোকটা এ শ্রেণীর, ও লোকটা বদমাইস্ ভণ্ড এই সব বলি, কিন্তু শ্রেণীভেদ মাঝে মাঝে উঠিয়ে দিতে হয়—আমাদের ভিতর অনেককিছু প্রবৃত্তিই এক সঙ্গে থাকে—ভালো, মন্দ, সদাচার, কদাচার, বীরত্ব, দুর্বলতা। শ্রীমতী টামলার মেয়েকে বললেন— থাম্ অ্যানা, তুই বড্ড বেশি নৈরাশ্যবাদী, এতো মনমরা হয়ে কথা বলিস নি।

মা আমি শুধু কি নিজের কথা বলছি, আমি তোমার কথা বলছি, তোমার জন্য আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে—বাবা সমাজে ঘুরে বেড়াতো, একটা চঞ্চল, যুবকের মত, সেটা সহনীয় হলেও, তুমি যদি আজ এমন কিছু করো যাতে তোমার মন সাড়া দিলেও দেহ দেয় না, তাহলে সেটা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা—তোমাকে সমাজ শাসন করবে, লোকে শ্লেষ করবে। বাবাকে সমাজ বলতো যে জোয়ান লোকটার নৈতিক দুর্বলতা আছে, কিন্তু এই বয়সে তোমাকে ক্ষমা করবে না যতোই না বলো, যে দেহে ও মনে সুষ্ঠুসামঞ্জস্যবিধানই সমাজের আপদ্-ধর্ম। কারণ এই সামঞ্জস্য ছাড়াও মানুষের অন্তরে, ঔচিত্যবোধের সামঞ্জস্য কাজ করে চলেছে সেটাই তার অন্তর্দ্বন্দ্ব—তাকে প্রশ্রয় দেওয়া মানেই তোমার মানসিক জীবনের আঘাত, অশান্তি, অসুখ। তোমার কী মনে হয়—এটা সত্যি নয়। হ্যাঁ বাবারও যেমন সামাজিক জীব হিসাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কাছে কতকগুলি মূল সূত্র ছিল তেমনি তোমারও আছে—তাই নিয়ে তুমি গড়ে উঠেছো, তোমার নিজের ব্যক্তিগত সত্তাকে তৈয়ারী করেছো—এখন সেগুলোকে যদি ভেঙে দাও, তাহলে তুমি নিজেকেই ভাঙলে—সেইজন্যই আমি চিন্তিত হয়েছি—তোমার নিজের সত্তাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো—সেখানে যা কিছু মূল্যবান মনে করেছো, ধরে রাখো—তুমি ভাঙবে কেন? এই যে সেদিন কয়েক সপ্তাহ আগে রাত্রে তুমি উত্তেজিত হয়ে আমার ঘরে এলে চা খেতে, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল যে ডাক্তারের

সঙ্গে পরামর্শ করি—সেই যে ডাঃ ওবারলসকাম্প—যিনি এডওআর্ডকে ও আমাকে দেখেছিলেন—অবশ্য তোমার কোনোদিন ডাক্তার দেখাতে হয় না। সেদিন, আমায় ক্ষমা করো, তোমার কথা ডাক্তারের সঙ্গে সামান্য আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার পরে ভাবলাম—না, তোমার গোপন কথা কারুর সঙ্গে আলোচনা করা শুধু নিয়মবিরুদ্ধ নয়, নীতিবিরুদ্ধও।

থাক্ না অ্যানা, তুই ঠিকই করেছিস, তুই যে ডাক্তারের সঙ্গে আমার সম্পর্কে কথা কইবি ঠিক করিস নি এতে তোকে ধন্যবাদ দিই—কিন্তু তোর হঠাৎ একথা মনে হলো কেন? আমার নারীত্ব আবার রক্তিম হয়ে উঠেছে প্রেমের অদৃশ্য আকর্ষণে ও চাপে, এতে আর নতুনত্ব কি আছে—বেঁচে থাকা মানেই আশায় পূর্ণ হয়ে থাকা—এর আর কোনো অর্থ নেই।

না, মা, তোমার কাছে আমি কোন জবাবদিহি চাইছিনা—তাহলে, মা, এখন এসো, আমি একটু বিশ্রাম করি, এসব দিনে মেয়েরা একটু আলাদা থাকতেই ভালোবাসে।

অ্যানা তার মাকে চুম্বন করলে এবং শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। অবশ্য সামনাসামনি না থাকলেও দুজনেই দুজনের কথা ভাবছিল। অ্যানা তার মাকে তার মনের সব কথা বলতে পারে নি, তার মার এই যে শারীরিক পরিবর্তন এটা কদ্দিন থাকবে, এবং কীটন্ই যদি তার মাকে ভালোইবাসে, কতদিন সে ভালোবাসা স্থায়ী হবে। কেন একজন সুস্থ সবল অল্পবয়সী যুবক সমবয়সী অন্য মেয়েদের দিকে ঝুঁকবে না। তার মা প্রতিমুহূর্তে ভাববে যে এই বুঝি কীটন্ হাতছাড়া হলো—হয়তো তার আত্মসম্মানও লোপ পাবে। তবু তার মার শুধু সুখের আর ভোগের দিকেই দৃষ্টি নেই—দুঃখ ও বেদনাও সে বোঝে। কারণ এ ধরনের প্রেমের পরিণাম দুঃখের—স্বপ্নের সমাধি যখন ঘটবে।

এদিকে রোজেলী ভাবছিল তার মেয়ের কথা—বিশেষ করে

এডওআর্ডের রোমান্টিক মন যদি এটাকে পারিবারিক সম্মানের প্রশ্নই করে তোলে—তার জীবন পণ করে বসে—এতে মায়ের মনে ছেলের প্রতি গৌরববোধই হয়েছিল, কিন্তু অ্যানার একটা কথা তাঁর ভালো লাগে নি—অ্যানা কি মনে করে না যে তিনি উদার প্রকৃতির মহিলা নন্—তার অন্তরের গভীরে কি কিছু সন্দেহ সংশয় লুকিয়ে আছে। —তবু এই নূতন পরিস্থিতিতে তাঁর নব প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের পূর্বরাগে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর মেয়ে যা বলেছে যে তাঁর অন্ত ও বহির্জীবনে যে একটা বিরোধ ও সংঘাত চলেছে সেটা ঠিক। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করবো—হয়তো এটা দুরাশা কিন্তু ত্যাগটাই যদি ভোগ হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি—তারই মধ্যে থাকবে আপনাকে বিলিয়ে দেবার স্বাধীনতা ও সাম্য। রোজেলী ঠিক করলেন যে তিনি সেই পন্থাই অবলম্বন করবেন।

এর তিনদিন পরে কেন্ কীটন্ উদয় হলেন টামলার ভবনে—এডওআর্ডের সঙ্গে গল্প হলো, ইংরাজী পাঠ এবং তারপর প্রথামত নৈশভোজে যোগ। তাকে দেখে রোজেলী সত্যই ভারী খুশী হলেন। কেনের ছেলেমানুষী মুখ, তার যৌবনোচিত কথাবার্তা, তার সুগঠিত দেহ, সবই রোজেলীকে চঞ্চল করে তুলেছিল, উজ্জ্বল চোখের দীপ্তিতেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল এবং বদনমণ্ডলও আরক্তিম ছিল। তিনি ভিতরে যে উল্লাস বোধ করছিলেন তারই প্রকাশ হচ্ছিল বাইরে। সেদিন এবং এর পরে প্রতি সপ্তাহে যখনই কীটন্ আসতেন তখনি রোজেলী তাকে কাছে টানতেন, বসাতেন, এমনভাবে তার হাত ধরতেন, তার দিকে চেয়ে থাকতেন যে অ্যানা ভাবতো যে তার মা বুঝি ঐ তরুণকে তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বলে প্রেম নিবেদন করে ফেললে। অবশ্য সেটা তার পক্ষে অসম্ভব ভয় —এমন কিছু ঘটলো না যাতে তার মার ব্যবহারে কেউ কিছু বলতে পারে—যেন এক সদাশয়া মহিলা তার পুত্রের বয়সী এক যুবককে সস্নেহ অভিবাদন জানাচ্ছেন—স্নায়বিক উত্তেজনাহীন মধুর ব্যবহার।

কীটন্ অবশ্য অনেকদিন থেকেই বুঝতে পেরেছিল্ যে সে এই বর্ষিয়সী শুভ্রকেশা মহিলার হৃদয় জয় করে ফেলেছে, কিন্তু এর পরিণাম কি হতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করে নি। এই দুর্বলতার আভাস পেয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা যে কিছুটা কমেছিল সেটা সত্য, তা ছাড়া এই ঘটনাটি তার মনের দিক থেকে তার পৌরুষকে উত্তেজিত করছিল। তার সহজ মন মাঝে মাঝে এই পঞ্চাশ বছরের মহিলার দিকে ঝোঁকেনি যে তা নয়—তাঁর সুন্দর গভীর চোখ দুটি তাকে আকৃষ্ট করেছে এবং এমন কি সে ভেবেওছিল যে এর সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য প্রেমের আদানপ্রদানে মন্দ হয় না ; অবশ্য তখন হৃদয়ঘটিত ব্যাপার সে চালাচ্ছিল আর একটি মহিলার সঙ্গে—এমেলি বা লুইসার সঙ্গে নয়—যার কথা রোজেলী স্বপ্নেও ভাবেন নি। অ্যানা ক্রমশঃ দেখলে যে এই তরুণ যুবকটির তার ছাত্রের মার প্রতি ভাবভঙ্গী ক্রমশই বদলাচ্ছে।

ভালো মানুষের ছেলেটি কিন্তু রোজেলীর ধাত ঠিক বুঝতে পারে নি। অবশ্য যখনই দেখা হতো, তখনি রোজেলী তাকে কাছে টেনে নিতেন, প্রায়ই অঙ্গস্পর্শ ঘটতো, চোখের উদ্দীপ্তিতে ঔৎসুক্য জেগে উঠতো, তবু কোথায় যেন থাকতো একটা সবল আত্মসম্মান যে তাকে আর বেশিদূর এগুতে দিতো না, ফলে সে অতিরিক্ত বিনয়ী হতো ও বশ্যতা স্বীকার করতো। এটা যে কীজন্য ঘটতো কীটন্ বুঝতে পারতো না। সে ভাবতো—ভদ্রমহিলার রকমটা কী? তিনি কি আমায় ভালোবাসেন না? শেষকালে ঠিক করলে যে ছেলে-মেয়েরা থাকে বলেই তিনি অভোটা মুখর হতে পারেন না; বিশেষ করে খোঁড়া মেয়েটির জন্য। কিন্তু দেখা গেলো যে দুজনে একা থাকলেও রোজেলীর ব্যবহারে কোন পরিবর্তন নেই। একদিন তাঁরা দুজনে যখন ড্রয়িংরুমে বসে এবং আর কেউ যখন সেখানে ছিল না তখন মার্কিনী কায়দায় রোজেলীর 'র'এর উপর গদগদ হয়ে ডাক দিতে তার স্বপ্ন ভেঙে গেলো। রোজেলী লাল হয়ে উঠে কিছুক্ষণ পরেই

ড্রয়িংরুম ছেড়ে চলে গেলেন এবং সারা সন্ধ্যা ও রাত্রে ওর দিকে না চাইলেন, না কথা কইলেন।

এবারে শীতের প্রকোপও কমে এলো—তাড়াতাড়ি—তুষারপাতের চেয়ে বৃষ্টির দাপটটিই ছিল বেশি। ফেব্রুয়ারী মাসেও কয়েকদিন বেশ রৌদ্রস্নাত দিন এসেছিল—যেন বসন্তের পূর্বাভাস হিসাবে। রোজেলী ছিলেন সত্যিকার প্রকৃতি ভক্ত, বসে বসে দিন গুণতেন কবে ড্যাফোডিল ফুটবে, রং-এ রং-এ আকাশ বাতাস ঝলমল করবে—এ নিয়ে মেয়ে অ্যানার সঙ্গে কতো গল্প, কত আলোচনা, বলতেন—দেখ্ শীতের শেষে যখন ধরিত্রী আবার ফুল ফোটান্ তখন নব-কিশলয়ের দল সেই পুরোনো বারতাই বনময় নিয়ে আসে—শরতে যাকে দেখেছিস সেই তো বসন্তে আবার ফিরে এলো নতুন নামে—ক্রকাস নাম দিলুম একটাকে, আর একটাকে ড্যাফোডিল।

হ্যাঁ, মা, তোমার প্রকৃতি দেবী তাঁর ঘরকন্না কতরকমেই সাজান তা তিনিই জানেন—আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করবার উপায় আর কী—

না, অ্যানা তোর দোষই হচ্ছে, তুই প্রকৃতিকে বুঝতে চাস না, আমি যখন তার রূপ মাধুর্যে মুগ্ধ হই বা তার রসসত্রে ডুবে থাকি তুই কেবল ঠাট্টা করিস—ওরে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের গূঢ় সম্পর্ক—তুই খ্রীষ্টমাসের সময়ে জন্মেছিস—যখন মানবপুত্রের হয়েছিল আবির্ভাব—তোর জীবনের স্বভাবই হবে সেই বিশেষ দিনটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। চারদিকে বরফ, ঠাণ্ডা, জমে যাচ্ছি আমরা, তারি মধ্যে তিনি এলেন যিনি ভগবানের প্রতীক—নিয়ে এলেন করুণা, নিয়ে এলেন বিচার-বোধ, নিয়ে এলেন প্রেম ভালবাসা—তোর মধ্যেও তাই দেখি—তুই যে খ্রীষ্টমাস যুগের মেয়ে—তোর প্রকৃতিতে তার ছাপ লেগে রয়েছে। আর আমি হচ্ছি বসন্তকালের মেয়ে—আমি বারে বারে ঝরা পাতার মাঝ দিয়ে নবমঞ্জরীতে ফুটে উঠি—তাই আমি ভালোবাসি এই ঋতুটিকে—আমার মনের গঠনও সেই দিকে।

সত্যিই মা তাই, আমি কিছু বলবো না এর বিরুদ্ধে, দেখে নিয়ো—

কিন্তু মুখে রোজেলী যাই বলুন—যে জীবনের উদ্দামতার কথা তিনি ভাবছিলেন বা অভ্যস্ত ছিলেন তাতে যেন একটু বিচ্যুত হয়ে পড়ছিলেন তিনি। জীবনটা ঠিক তিনি যা চান সেরকম ভাবে চলছিলো না। মেয়ের সঙ্গে কথায় যা কিছু নৈতিক আদর্শ তিনি মনে মনে মেনে নিয়েছিলেন সব কিছুই যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় যেন অসঙ্গতি, কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল বারে বারে।

অ্যানার অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছিল, যে তার মার মনে যেন একটা কিসের দ্বন্দ্ব বাসা বেঁধেছে—তার জন্যই কী তার মা নিজেকে ভোগের আরামে ভাসিয়ে দিতে পারছেন না। তা ছাড়া তার মনে হচ্ছিল, তার নিজেরও মনের গোপনে অভিসার যাত্রা সুরু হয়েছে কিনা—ছি, ছি। সে কী ভাবছে—যে যৌবনে যা সে পারে নি বা যা সে পায়নি, তার মা এই বয়সে তা পাচ্ছেন এবং সেই জন্যই কী সে তার মাকে নৈতিক উপদেশাবলী শুনিয়েছে। হয়তো তাই, তার নীতিবোধ একটু পীড়িত হয়েই উঠছিলো।

সে দেখলে যে তার মা বেড়ানো কমিয়ে দিয়েছেন অথচ এই বেড়ানোতে তাঁর কতো আনন্দ ছিল—একটু গেলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, যিনি গৃহকর্মের জন্য এধার ওধার ঘুরতেন তিনিই এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন। এখন তিনি বিশ্রাম করেন অনেকক্ষণ ধরে এবং তার শরীরের পূর্ণ যৌবন সত্ত্বেও তার ওজন কমে যাচ্ছে এবং তার বাহু দুটো শীর্ণ হচ্ছে। এখন আর লোকেরা জিজ্ঞাসা করে না যে কোন্ যৌবন সরসী নীরে তিনি স্নান করছেন, কোন্ ফোয়ারার জলে। তার চোখের নীচে একটা অলক্ষুণে ক্লান্ত ভাবের নীল ছোঁয়াচ যেন লেগে থাকতো যা রুজ ঘষেও যেতো না। অবশ্য তিনি তার যৌবনপ্রাপ্তিকে উপলক্ষ্য করে গালে রুজ মাখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু তার গায়ের চামড়ার উপর একটা হল্‌দে ম্লানিমা তার যৌবনকে যেন ব্যঙ্গ করতো। কিন্তু কেমন আছেন কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—বেশ আছি, কেন আপনার কিছু মনে হচ্ছে নাকি?

কুমারী অ্যানা ভাবলে তার মার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারকে দেখিয়ে আর দরকার নেই। সত্যিই তার মনে একটু অপরাধবোধ জেগেছিল। তা ছাড়া তার মার জন্য একটু মমতাও ছিল।

তাই অ্যানা খুবই খুশি হয়েছিলো যখন রোজেলীই একদিন রাত্রে খাবার পর ছেলে মেয়ে ও কীটনের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলে একটা বেড়ানোর প্ল্যান। অবশ্য আহারাদির পর তখন একটু আধটু পান চলছিল—সবাই এরই মেজাজ শরীফ্—বিশেষ করে রোজেলীর—এখনও একমাস হয় নি যেদিন রোজেলী অ্যানাকে তার ব্যক্তিগত জীবনের গোপন সন্ধান দিয়েছিলো তাকে শয়ন কক্ষে ডেকে। রোজেলী সেদিন বেশ স্ফূর্তিতে ছিলো সাবেক দিনের মতো। প্রস্তাবটা অবশ্য ঐতিহাসিক কীটনের—সে ঐ জায়গাটার কথা তুলেছিল—ওখানকার রাজাদের দুর্গমালা, অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য—ইলেকটর কার্ল থিয়োডরের ডুসেলডর্ফ ছেড়ে কোয়েজিনজেনে যাওয়া এবং তারপরে মিউনিখে—সেখানকার আর্ট আকাদমী, প্রাসাদ উদ্যান এসব পুরাতত্ত্বের কথা ওরা বলাবলি করছিল। জাগেরহফ্ ও হোল্টারহফ্ দুর্গের কথাও উঠলো। এডওয়ার্ডও সাগ্রহে এসব আলোচনায় যোগ দিয়েছিলো, রাইনের 'রকোকো' আর্টের কথা কীটন কিন্তু শোনে নি কিম্বা নদীর ধারের বিখ্যাত বাগানে যায় নি। ফ্রাউটামলার ও অ্যানা দু'একবার বায়ু পরিবর্তনের জন্য সেথায় গিয়েছিলেন। গৃহকর্ত্রী তো আনন্দে গ্রাম্য জার্মান ভাষাই ব্যবহার করলেন—অ্যানা জানতো যে যখন তার মা ঐ ভাষায় কথা কন তখন তার মন বেশ প্রফুল্ল। তিনি বললেন—ডুসেলডর্ফের বাসিন্দা হয়ে, এসব যারা দেখে নি তারা শহরের অধিবাসী বলে গণ্যই হয় না—এখানকার দুর্গ দেখতে দেশবিদেশের লোক আসে না, তোমাদের এসব দেখা উচিত—চলো আমরা একদিন হোল্টারহফে যাই—দু-চারদিনের মধ্যেই যাওয়া যাক্—এখন সময়টা ভাল, মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির পরিবেশ—পারদযন্ত্র ও বেশি ওঠানামা করছেনা।

বাগানেবাগানে নবীন মঞ্জরীর দল, বনময় কিশলয়, গ্রীষ্মকালে যাওয়ার চেয়ে এখনই ভালো, অ্যানা ও আমি সেই সময়েই গিয়েছিলাম। তোর মনে আছে—যে দুর্গপরিখার জলে যেসব কালো রাজহাঁস জলে ভাসছিল,—তাদের ম্লান অভিমান, লাল ঠোঁট আর নৌকোর দাঁড়ের মত পা নিয়ে—মা গো, মা, আমার এখনও যেন বমি আসে ওদের কথা ভাবলে। আমরা যখন ওদের খেতে দিচ্ছিলাম, তখন ওরা এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন মোটে ক্ষিধে নেই। এবারে ওদের জন্য কিছু রুটী নিয়ে যেতে হবে। আজ তো শুক্রবার, রবিবারই যাওয়া যাবে—এডওআর্ডের ঐদিনই শুধু সুবিধা আর মিঃ কীটনের। অবশ্য রোববার লোকের ভিড় হবে, কিন্তু তাতে কী, আমার তো লোকজনের সঙ্গে মিশতেই ভালো লাগে, তাদের আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে। এই ধরো না—ওবারকাসেলের মেলাগুলো, কেমন ভাজাখাবারের গন্ধ বেরুচ্ছে, ছেলেরা চিনির কাটি চুষছে, সার্কাস দেখানো হচ্ছে এক দিকে আর যত সব মেঠো বাজে লোক শহর ও গ্রাম থেকে দলেদলে এসে হৈহৈ করছে, চেঁচাচ্ছে, আনন্দ করছে। ভারী মজার লাগে আমার। অবশ্য অ্যানার মনোভাব অন্যরকম। সে বলে এর ভিতরে একটা দুঃখের অন্তর্যাতনা আছে—হ্যাঁ তুই তো বলিস তাই—তোর ভালোলাগে ঐ দুর্গপরিখার জলেতে কৃষ্ণ রাজহংসগুলির অভিজাত দুঃখ······ আচ্ছা ডাঙ্গার রেলওয়ে দিয়ে না গিয়ে জলে জাহাজে গেলে কী রকম হয়। নদীতে যাওয়া আরো মজার, রাইন্ পিতৃদেব আমাদের নিয়ে যাবেন। এডওআড জাহাজের টাইমটেবিলটা দেখো তো—আচ্ছা একটা প্রাইভেট মোটর বোট ভাড়া করলে কেমন—আমরা নিজেরাই যাবো, ঐ কালো হাঁসগুলোর মতো ভাসতে ভাসতে—তা এখন ঠিক করতে হবে যে আমরা সকালে বেরুবো না বিকালে।

সবাই বললে সকালেই ভালো। এডওআড বললে দুর্গদ্বার খোলা থাকে দর্শকদের জন্য শুধু দুপুরের পর কয়েকঘণ্টা। ঠিক হলো

রোববার ভোরেই বেরুনো হবে। রোজেলিরই উৎসাহ বেশি, তারই আতিশয্যে সব ব্যবস্থা তখনই করা হলো। কীটন্ ভার নিলে মোটরবোট ভাড়া করার। কথা রইলো যে পরশু অর্থাৎ রোববার দিন সকাল নটার সময় সবাই জলের ধারে র‍্যাথাস জেটিতে এসে জুটবে।

তাই হলো। দিনটা রৌদ্রময় ছিল বটে কিন্তু বড় বেশি বাতাসের দাপট। জেটীতে বহু ভিড়, ঠেলাঠেলি, বিশেষ করে কলোন ডুসেলডর্ফ ন্যাভিগেশন কোম্পানীর জাহাজে। জনতা সাইকেল নিয়ে চলেছে দলে দলে। ওদের ভাড়া করা বোটটা ঠিক করাই ছিল একধারে। ওর যে সারেং, সে লোকটা ছিল অদ্ভুত, কান দুটো বিঁধে দুটো মাকড়ি পরেছে, ওপরের ঠোঁট বেশ ভালো করে কামানো আর লাল দাড়ি ঝুলছে—সে মহিলাদের ধরে তার বোটে তুললে। সামনেই বেকাঁনো বেঞ্চি ছিল সেখানে ওরা বসলো। বোট ছেড়ে দিলে. চওড়া নদীর দুধারে জনপদগুলি সাধারণ নদীর ধারের শহরের মতো, বিশেষ কিছু দেখবার নেই—সেই গুদামঘর, মাল নামাবার জেটী, সেই ফ্যাক্টরী কারখানা ইত্যাদি। তবে মোটরবোট যতই এগুতে থাকে ততই দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়। পাথরের জেটীর পিছনে দেখা দেয় শহরতলী ও গ্রামের দৃশ্য, সবুজের চিহ্ন, জেলেদের আস্তানা। ঐসব গ্রামগুলোর নাম এডোওয়ার্ড ও কীটনের জানা ছিল—কোথাও বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয়েছে কোথাও মাঠ, কোথাও পুকুর, কোথাও উইলোর ঝোপ। রোজেলী বললে—এই ভালো হয়েছে—সেই শহরতলীর মধ্যে দিয়ে বিশ্রী রাস্তা বেয়ে আস্তে আস্তে যাওয়ার চেয়ে।

এই জলযাত্রা তাঁর খুবই ভালো লাগছিল—যেন মনে হচ্ছিল প্রকৃতির নিজের স্পর্শে মনের অর্গলবদ্ধ দুয়ার খুলে যাচ্ছিল, এমন কি চোখবুজে ঝোড়োহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে দুএককলি গান ও রোজেলী গেয়ে ফেললে 'ওগো জলঝড়ের রাণী তোমায় আমি ভালোবাসি, তুমি কি আমায় বাসো?' যদিও এ কয় সপ্তাহে তাঁর

মুখ কৃশ হয়ে উঠেছিল, তবু আজকের এই পরিবেশে তাঁকে ভারী ভালো দেখাচ্ছিল বিশেষ করে একটা পাতলা পশমের কোট ও তদুপযুক্ত কলারে। অ্যানা এবং এডোয়ার্ডও কোট পরেছিল এবং কীটন বসেছিল মা ও মেয়ের মাঝখানে একটা ধূসর রং-এর সোয়েটার ও গরম কোট পরে। তার রুমালটা বেরিয়েছিল এবং রোজেলী, একবার চোখটা খুলে সেটাকে পকেটের ভিতর গুঁজে দিয়ে একটু আদরমাখা বকুনির সুরে বললে—

আদবকায়দা জানতে হয়, হে ছোকরা। সে হেসে জবাব দিলে —ধন্যবাদ ম্যাডাম্। তার পর জিজ্ঞাসা করলে—কি গানটা গাইছিলেন তিনি।

গান—আমি কি গান গাইছিলাম নাকি? ওটা নাকী সুর, আসল গান নয়।

তার পর আবার চোখ বন্ধ করে গুনগুন করে গান ধরলেন— জলঝড় ওগো, তোমায় আমি কতো ভালোবাসি।

একদিকে মোটরের শব্দ—তা ভেদ করে রোজেলীর বাক্যস্রোত চললো—ওদিকে তার সাদা চুল হাওয়ায় দুলতে থাকে এবং তিনি বলতে থাকেন—রাইনের ধার বেয়ে এই জলযাত্রাকে আরো বাড়ানো যায় কিনা? হোটারহফ্ থেকে লেভারকুসেন, কলোন, বন্, গোডেস-বার্গ প্রভৃতি জায়গায়। রাইনের ধারে ধারে কতো সুন্দর জনপদ আছে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে, বাগান আছে, খনিজ জলসম্পদ ও প্রস্রবণ আছে, যা বাতের মহৌষধ। অ্যানা তার মায়ের দিকে চেয়ে দেখলে, ভদ্রমহিলার কোমরে বাতের ব্যথা আছে এবং মাঝে মাঝে তিনি বলতেন যে গোডেসবার্গ বা হোনেফে খনিজ জলচিকিৎসার জন্য যাবেন। কিন্তু তিনি এই যে বকে চলেছেন এর মধ্যে যেন একটা স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টা ছিল না, তিনি মাঝে মাঝে হাঁফাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন হাওয়ার সঙ্গে কথা কইছেন। অ্যানার মনে হলো যে তার মা বাতবেদনা থেকে এখনও মুক্ত নন।

ঘণ্টাখানেক পরে তাঁরা কয়েক টুকরো স্যাণ্ডউইচের ছোট ছোট কাপে করে পোর্ট গলাধঃকরণ করে প্রাতরাশ সারলেন। সাড়ে এগারটায় তাঁরা পৌছলেন, পুরনো দুর্গ ও বাগানের কাছে একটা নামবার জায়গা ছিল—বড় জাহাজ সেখানে লাগতো না। রোজেলী ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মাঝিকে ছেড়ে দিলেন—তাঁরা স্থির করলেন যে ফেরবার সময় তাঁরা শহরের রেলওয়ে দিয়েই ফিরবেন। ওখানকার বাগানটা নদীর ধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না—মাঝে পড়তো একটা মাঠ এবং একটা ভিজে পায়ে চলা পথ। তারপরেই সুবিন্যস্ত বিরাট বাগান—কোথাও উঁচু পথ, কোথাও দীর্ঘকায় বনস্পতির দল, কোথাও সুন্দর কাঁকরওয়ালা রাস্তা, কোথাও ফুলের কেয়ারি—কত রং কত রেখা—নানা ধরণের দুষ্প্রাপ্য গাছ, বিভিন্ন দেশ থেকে আনা। কীটন তো ক্যালিফোর্ণিয়া জাত কতো গুল্মলতা আবিষ্কার করে ফেললে।

রোজেলীর কিন্তু এসব দৃশ্যে কোন উৎসাহ ছিলনা। প্রকৃতি, যদি সোজা হৃদয়ের সঙ্গে কথা না কইতে পারে তাহলে তো সাধারণ হয়ে যায়। উদ্যানের শোভা তাকে বেশী মুগ্ধ করেনি। বৃদ্ধ বনস্পতিদের দিকে চেয়ে তিনি এডোয়ার্ডের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

অ্যানা ও কীটন যাচ্ছিল আগে আগে। অ্যানা কিন্তু হঠাৎ মতলব ঠিক করে এডোয়ার্ডকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—এটা কোন এভিনিউ বা বৃক্ষবাটিকা—ফলে এডোয়ার্ড এলো এগিয়ে আর কীটন পড়লো রোজেলীর পাশে। এইসব বৃক্ষবাটিকার নামও ছিল বেশ—যেমন "বিজয়বাটিকা" "পান্থবাটিকা" প্রভৃতি। কীটনই রোজেলীর কোটটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছিল—এখানে হাওয়ার উদ্দামতা ছিলইনা, বরং বেশ একটু গরম বোধ হচ্চিল। মাথার উপরে বাসন্তী আকাশের সূর্য্যদেব মৃদু তাপ বিতরণ করছিলেন এবং চারজনের মুখের উপরই তার আভা পড়েছিল। শ্রীমতী টামলার কীটনের হাতে তাঁর

কোটের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন—জামাটির যুবতী-জনোচিত ছাঁটকাট তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তারপর হঠাৎ তিনি বললেন—ঐ যে আমার কালো রাজহাঁসের দল। —দীর্ঘ পোপলারের ধার দিয়ে তখন তারা প্রাকার পরিখার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ঐ জীবগুলি ঠিকই বুঝতে পারছিল যে একদল দর্শক এসেছে, যারা খেতে দেবে।

কী সুন্দর, অ্যানা—ওদের চিনতে পারছিস? কেমন রাজবদুন্নত শিরে চলেছে দেখো—ঘাড় উঁচু করে। রুটির টুকরোগুলো কোথায়? কীটন পকেট থেকে বের করে দিলে খবরের কাগজে বাঁধা প্যাকেটটা। সেটা তার শরীরের উত্তাপে কিছুটা গরম হয়ে উঠেছিল। রোজেলী তো দুএকটুকরো মুখেই দিয়ে দিলে।

একী করছেন—এযে বাসি এবং শক্ত—কীটন বললে।

আমার দন্তরুচি কৌমুদি—বললেন রোজেলী। এমন সময় একটা কালো হাঁস তীরের কাছে এসে তার কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করে রোজেলীর দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চাইতে লাগলো, অর্থাৎ আমাদের জিনিস তুমি খাচ্ছো কেনো—

ওর হিংসে দেখে ওরা হাসতে লাগলো, এবং একটু ভীতও হলো। অবশ্য হাঁসগুলোকে তাদের প্রাপ্য দেওয়া হলো; রোজেলী তাদের ঐ শুকনো বাসি রুটির টুকরোগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো এবং তারা রাজকীয় ঔদাস্য ও গম্ভীর্যের সঙ্গেই নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে লাগলো।

অ্যানা টিপ্পনী কাটলে—দেখো মা আমার মনে হচ্ছে যে ঐ বুড়ো শয়তানটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে তুমি ওদের পাওনায় চোরের উপর বাটপাড়ি করেছো—সে যেন রেগেই আছে—

রোজেলী জবাব দিলে—তা নয়, প্রথমে একবার ভয় হয়েছিল, আমিই বুঝি সব খেয়ে নেবো, ওদের জন্য আর কিছু থাকবে না—না, নিশ্চয়ই খুব তৃপ্তি করে খেয়েছে কারণ আমি খেয়েছি যে—

তারপর তারা দুর্গের ধারে গিয়ে পৌঁছল এবং ছোট্ট গোল পুকুরটির পাড়ে, কাচের মত স্বচ্ছ জল তার, তার মাঝখানে একটি দ্বীপ এবং তার মাঝে শুধু একাকী একটি পোপলার গাছ দাঁড়িয়ে। ওদেরই সামনে দাঁড়িয়ে এক দল লোক অপেক্ষা করছিল—দুর্গের সব কিছু দেখাবার ও বোঝাবার বিস্তৃত বন্দোবস্ত ছিল—নিয়মিত 'গাইড' ছিল—এগারোটার দল তখনও দাঁড়িয়ে—তারা ততক্ষণে দুর্গের বাইরে নানা ধরনের কামান, মধ্যযুগীয় বীর নাইটদের 'কোট অফ্ আর্মস' মূর্তি প্রভৃতি দেখছিল, কোথাও দেখা যাচ্ছিল একটি দেবদূতের প্রস্তরময় মূর্তি, কোথাও বা অন্য কিছু। কোথাও বা জানালার ধারে গ্রীক্ কিংবদন্তীর নগ্ন প্যান ও তার সখীরা, কোথাও বা সিঁড়ির পাশে বেলেপাথরের সিংহচতুষ্টয়। কীটন্ খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল, ইতিহাসের এতো মালমশলা দেখে। সে সবেতেই বলছিল—কী চমৎকার, কী উত্তেজক—তার মনে পড়ছিল অতলান্তিকের পারে তার গদ্যময় দেশ। কারণ সেখানে না আছে ইলেক্টর বা তার নাইট বাহিনী, না আছে তাদের বদান্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা। ধনতান্ত্রিক অভিজাত সমাজের অতীত ঐতিহ্য এখানে ভেঙে পড়লেও তার নিদর্শনগুলো দাঁড়িয়ে আছে মহিমায়। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র হলেও ঐতিহাসিকতার ভিতরকার বস্তুটিকে শ্রদ্ধা করবার মত মন বা সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাবার মত উৎসাহ তার ছিল কিনা সন্দেহ তাই হঠাৎ একটা দ্বারপাল সিংহের ঘাড়ে সে ছেলেমানুষের মতো চেপে বসলো—অবশ্য তাদের পিঠে লোহার কাঁটা দেওয়া ছিল, যেমন থাকে খেলাঘরের ঘোড়ার পিঠে যাতে করে আরোহীকে উঠিয়ে দেওয়া যায়। একটা লোহার শিক সে হাতে করে জাপ্টে ধরল এবং আনন্দসূচক ধ্বনি করতে লাগলো—হী, হী, গিড্ড্যাপ, যেন একজন প্রাণোচ্ছল তরুণ যৌবন মদমত্ত ক্রীড়ায় মেতেছে। অ্যানা ও এডওআর্ড তাদের মায়ের দিকে চাইছিলো না।

তারপর দরজা খোলার শব্দ হলো, কীটন্ তার পশুবাহনের পিঠ

থেকে নেমে পড়লো। ততক্ষণে দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক এসে গেছেন—মনে হলো তিনি একজন যুদ্ধে ফেরৎ মার-খাওয়া মানুষ—এখন এই ধরনের চাকরী নিয়ে দেশসেবার পুরস্কার পাচ্ছেন। তিনি এসে দাঁড়ালেন মস্তো বড় দুর্গদ্বারের কাছে, তিনি একদিকে সবাইকে প্রবেশপত্র দিতে লাগলেন, আধেকটা ছিঁড়ে অন্যদিকে হেঁড়ে গলায় বাক্যস্রোতের তুফান বইয়ে দিলেন—নানা ধরনের টুকরোটাকরা খবর, যা তিনি বহুদিন ধরেই দিনের পর দিন বলে আসছেন—যেমন এই যে সব স্থাপত্যের চিহ্ন দেখছেন এ সব রোমের শিল্পীর হাতের—ইলেকটর তাঁকে সেখান থেকে আনিয়েছিলেন, এই যে বাগান আর দুর্গ দেখছেন এর স্রষ্টা হচ্ছেন ফরাসী দেশীয়, রাইনের ধারে রকোকো আর্টের সুন্দর নিদর্শন এগুলো—দুর্গে আছে পঞ্চান্নটিঘর, তৈয়ারীর খরচ হয়েছিল আটলক্ষ টেলার ইত্যাদি ইত্যাদি।

সামনে ঘেরা বারান্দায় কেমন একটা চামসে শৈত্যের ভাপ আসছিল। সেখানে দর্শকদের জন্য ফেল্টের নৌকোর মত দেখতে চটি জুতো ছিল। নিয়ম ছিল যে দুর্গের সুন্দর কারুকার্যময় মেঝেকে শক্ত জুতোর বেপরোয়া ঠোকর থেকে বাঁচাবার জন্য এই জুতো যাত্রী ও যাত্রিনীদের পরতে হতো—অনেকেই হৈ হৈ করে উঠলো, সবাইকেই মেনে নিতে হলো এই সাধারণ নিয়ম—তারপর একটির পর একটি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে চললো দর্শকের দল আর তাদের ঐ গাইড্। পরিদর্শকও বক্‌বক্ করে চলেন, এঁরাও ইতিহাস শোনেন, দুর্গাধিপতিদের শৌর্যের বীর্যের, প্রেমের কাপুরুষতার ইতিহাস। এক এক ঘরে এক এক ধরনের সাজ-সজ্জা কিন্তু মাঝের দালানগুলি সবই তারকাকৃতি ও ফুলের অদ্ভুত নক্সায় ভর্ত্তি। তাদের চকচকে পালিশে দর্শকদের মুখ দেখা যায়, তাছাড়া সে যুগের ভারী-সাজসজ্জা ফার্ণিচার, মস্ত বড়ো আরশীগুলো গিল্টকরা ফ্রেমে সুন্দর ট্যাপেস্ট্রী, ঝোলানো ক্রিস্টাল কাচের ঝাড়। দোরের উপরে শিকারের ও গান-বাজনার সরঞ্জাম, সব মিলিয়ে বেশ একটা মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি

করেছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন একটির পর একটি ঘর খুলে যাচ্ছে। অবারিত ঐশ্বর্যের উন্মুক্ত পরিচয়। ইন্দ্রিয়সুখের নানা উপায়, সোনার জলে লেখা পাঠগুলি সবই সুখোচিত রীতি--নীতি ও রূপরেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য সম্বলিত। গোল খাবার ঘরের কোণে কোণে দাঁড়িয়েছিল এ্যাপলো ও বনদেবীদের মূর্তি, কাঠের চক্‌চকে মেঝে পালিশে মার্বেলকেও হারিয়ে দিয়েছিল। একদিকে সুন্দর করে সাজানো ও আঁকা একটি উঁচু মঞ্চ বা কিউপোলার মধ্য দিয়ে দিনের আলো প্রবেশ করতো, এবং সেইখান থেকে সুর লহরী ভেসে এসে ভোজনকারীদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতো।

কেন্ কীটন্ আর শ্রীমতী টামলার পাশাপাশি যাচ্ছিলেন। আমেরিকানদের মধ্যে একটা সৌজন্যের রীতি হচ্ছে যে মহিলাসঙ্গিনীদের সন্তর্পণে গায়ে হাত দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এডওআর্ড ও অ্যানা তখন পেছিয়ে পড়েছে, অনেক অপরিচিতের ভিড়, এবং তারা দুজনে ঠিক দুর্গ তত্ত্বাবধায়কের পিছনেই ছিল। তখন সে তার হেঁড়ে গলায় সাজানো কথার মালা, ইতিহাস বলে যাচ্ছিল এবং দর্শকদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে কী তারা দেখছে। অবশ্য এ কথা জানিয়ে দিয়েছিল সে—যা কিছু দেখবার সবই দেখা যাবে না—কারণ এই দুর্গ পঞ্চান্নটি ঘরের—এবং বেশ কটু ভাবে সে এ সব উক্তি করছিল—কতো যে গুপ্ত মহল এবং রহস্য আছে তা বলা যায় না—তখনকার দিনের ভদ্র-মহোদয় ও মহোদয়ারা লুকোচুরির লীলাখেলাতেও সুপক্ক ছিলেন, যেমন সে একটা গ্লাসকেসের দিকে দেখালে—একটা বোতাম টিপতেই দেখা গেল সেখান দিয়ে একটা ছোট্ট গোলাকার সিঁড়ি নেমে গেছে—বেশ সুন্দর কাজ করা। কাছেই ছিল একটা নরমূর্তির মাথার প্রায় তিনভাগ—চুলের ভেতর লতায় পাতায় ঘেরা বড় বড় জাম ঝুলছে। তার মুখে ছাগলের দাড়ি এবং তদুপযুক্ত হাসি—যেন অভ্যর্থনা করছে অতিথিদের। সবাই আঃ ওঃ করলে। গাইড বললে—আর কী দেখছেন, চলুন্ এগিয়ে যাওয়া যাক, বলে আয়নাটা ঠিক করে রেখে

দিলে—আর এক জায়গায় দেখা গেলো, চমৎকার সিল্কের পরদার পিছনে একটি গুপ্ত দ্বার আছে—একটা সেকেলে গন্ধও বেরুচ্ছে।

যে কাল যে ধরন……বলে সে বোকার মত এগিয়ে চললো।

পায়ে যে নৌকোর মতো ফেল্টের জুতোগুলো পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল না, শ্রীমতী টামলার তাঁর একপাটি চটি হারিয়েই ফেললেন। মসৃণ মেঝেয় একটু দূরেই ছিটকে গিছলো এবং কীটন্ হেসে সেটাকে উদ্ধার করে এনে শ্রীমতীর চরণে যখন পরিয়ে দিচ্ছিলো তখন আর একদল দর্শক তাদের কাছে এসে পড়েছে। সে তখন শ্রীমতীর বগলে হাত দিয়ে ওকে আবার সঙ্গিনী করে যখন যাবার জন্য প্রস্তুত, তখন শ্রীমতী এক স্বপ্নময় হাসি হেসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, যতক্ষণ না অন্য দর্শকরা অন্য ঘরে চলে যায়, তারপর পরদায় একদিকে কীটনের স্পর্শসুখ অনুভব করতে করতে সুন্দর নরম ট্যাপেস্ট্রীগুলোয় হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন।

কীটন্ চুপিচুপি বললে—এটা আপনি ঠিক করছেন না—ওটা তো সেই গুপ্তঘরের দ্বার, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এইদিকে আসুন। সে খুঁজে স্প্রিংটাকে বের করল এবং একটা পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধওয়ালা লম্বা বারান্দার মত জায়গা চোখে পড়লো—তারা একটু এগিয়ে গেলো। চতুর্দিকে অন্ধকার। তার গভীর অন্তঃস্থল থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রোজেলী, তার দুবাহু দিয়ে তরুণ যুবকটিকে জড়িয়ে ধরল—সেও ওর কম্পমান দেহকে আলিঙ্গন করলে—তার কণ্ঠে মুখ রেখে রোজেলী গদগদ ভাষায় বললেন—কেন্, কেন্, আমি তোমায় ভালোবাসি, ভালোবাসি, তুমি জানো, তোমার কাছ থেকে এটা আমি সম্পূর্ণভাবে লুকোতে চেষ্টা করি নি—সত্যি করে বলো দিকিন্, একটু ভালোবাসো কিনা আমায়, পারো আমায় তোমার তাজা যৌবনের একটু অংশ দিতে, প্রকৃতি আমাকে নতুন করে এই বৃদ্ধ বয়সে জীবনের মহিমা বোঝাচ্ছেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে

এসো, কাছে নিয়ে এসো, তোমার ঐ মুখমণ্ডল, ওই ওষ্ঠযুগল,—হে আমার প্রেমজাগানিয়া—বলো, বলো,—একবার ঐ অধর স্পর্শ করতে—আমার মনের বাসনা যে অগ্নিময় হয়ে উঠেছে—তোমার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠেছি··· আমি আর পারছি না—আমার প্রকৃতি আমায় একদিকে টানছে—আর জন্মগত আচার বিচার শিক্ষা দীক্ষা শালীনতা অন্য দিকে—তোমার জন্যই আমার এই বুভুক্ষা—এই তো তোমার মাথার চুল, তোমার মুখের গন্ধ, নাকের নিঃশ্বাস, এই তো তোমার বাহুলতা আমায় ঘিরে রয়েছে, তোমার শরীরের তপ্ততা আমায় উত্তপ্ত করছে—সাধে কী আর কৃষ্ণ রাজহংস আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

এইরকম আবোল তাবোল বকে তিনি ওঁকে জড়িয়ে ছিলেন তন্দ্রাহতের মত। কেন্ ওকে সামলে বারান্দা দিয়ে টেনে নিয়ে এলো—সেখানে একটু আলোও আসছিল। বসিয়ে দিলে একটা মূর্তির নীচে—একটা অন্ধ কিউপিডের।

রোজেলী হঠাৎ কেঁপে উঠে বললে—না, না, এ যেন মৃত্যুর দেশ—না, কেন্, এই পচন ও পতনের মধ্যে থেকে কোন লাভ নেই—এ সবই অতীতের—এর ভবিষ্যৎ কোথায়—না, না আমি ভেবেছিলাম—তোমায় আমি যৌবনের সমুন্নত মহিমায় দীপ্ত দুপুরে আহ্বান করে নেবো, এরকম পুরনো কবরের মধ্যে বসে প্রেমালাপ নয়। চলো, ফিরে চলো, না, না এই দৈত্যদানবের ভূতের রাজ্যে আর নয়। আমি আসবো কাল সকালে তোমার কাছে, বলবো সব কথা, তোমার ঘরে, না, হয়তো আজও আসতে পারি—আমার বুদ্ধিসম্পন্না ঐ যে কন্যারত্নটি আছেন, অ্যানা—তাঁকে ফাঁকি দিয়ে। কীটন্ প্রতিশ্রুতি দিলে। কিন্তু কীটনের মতে আর বেশী দেরি করা নয়, এখুনি তাদের ফেরা উচিত। অন্য দোর দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো, সেই অতীতের মৃতবিলাস কক্ষ হতে, এবং কিছুটা ঘুরে, অনেক ধাক্কাধাক্কি করে খোলা হাওয়ায় পৌঁছল। সেখানে প্রকৃতির

আর এক রূপ, আর এক বিন্যাস, আর এক ঐশ্বর্য—জলের কল্লোল শোনা যাচ্ছে, ফুলের রংএ রঙীন্ শ্যামল বনভূমি,—দুর্গের পিছনের দিকের উদ্যান—অন্য দর্শকরা তখন সেখানে এসে পড়েছে, অ্যানা আর তার ভাইও পিছনে রয়েছে।

কোথায় ছিলে তোমরা?

সে কথা তো আমরাও জিজ্ঞেস করতে পারি?

তোমরা কোন্ দিকে গেলে আর আমরা কোন্ দিকে গেলুম কিছুই বুঝতে পারলাম না—

অ্যানা বললে—তোমার পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাওনি ঠিকই?

রোজেলী বললে—তোদের চেয়ে নয়—

কেউই কারুর দিকে চাইলে না।

দুদিকে রোডোডেনড্রনগুচ্ছের সার পেরিয়ে তারা ফিরে এলো সেই পুকুরটির ধারে—সেখান থেকে ট্রামের রাস্তা দূর নয়। নদী দিয়ে আসতে যা সময় লেগেছিল ফিরে আসতে তার চেয়ে কম সময়ই লাগলো, যদিও জনবহুল শিল্পসমৃদ্ধ অনেকগুলি শহরতলি পেরিয়ে আসতে হলো। ভাইবোন দুএকটা কথা বললেও, মা-র সঙ্গে তাদের কথা হয় নি। অ্যানা শুধু চেয়ে দেখছিলো যে তার মা মাঝে মাঝে কাঁপছে, মা-র হাতটা সে ধরেছিলো। শহরে ফিরে তাদের পার্টি ভেঙে গেলো।

শ্রীমতী টামলারের কিন্তু কীটনের কাছে আর যাওয়া হয় নি। সেই রাত্রেই তিনি হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। যে প্রাকৃতিক ঘটনা তাকে উল্লসিত করেছিল, সাময়িকভাবে উজ্জীবিত করেছিল, সেইটেই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। রাত্রে প্রচুরভাবে রক্তস্রাব হয়ে, তিনি কোনোরকমে উঠে ঘণ্টা দেওয়াতে তার মেয়ে ও পরিচারিকা দৌড়ে আসে এবং তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে।

তখনি ডাক্তার ওবারলসকাম্পের কাছে খবর যায়। একটু সুস্থ হলে রোজেলী অবাক্ হয়ে যান তাকে দেখে—কী ডাক্তার, আপনাকে

ব্যস্ত হয়ে মিছিমিছি ডেকে এনেছে বুঝি—এ সব অ্যানার কাণ্ড—এ সব ঝামেলা মেয়েদের তো আছেই।

জানেন শ্রীমতী টামলার, এ সব জিনিসের জন্য আবার একটু হুঁসিয়ারীখবরদারীও দরকার। অ্যানাকে বললেন—মাকে শীঘ্রই জরায়ু সংক্রান্ত হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে অ্যাম্বুলেন্সে করে—হয়তো এই যে স্রাব—যার কথা তিনি প্রথম শুনলেন—হচ্ছে কোন বিশেষ কারণে, হয়তো বা টিউমার যার জন্য অস্ত্রোপচার দরকার। হাসপাতালে প্রফেসর মুথিসিয়াস চীফ সার্জেন আছেন তিনি দেখে শুনে যা ব্যবস্থা দেবেন তাই করাই যুক্তিসঙ্গত। তার মা কোন বাধা দিলেন না—অ্যানা একটু আশ্চর্যই হলো।

হাসপাতালে পরীক্ষা করে ধরা পড়লো ব্যাধি—বয়সের অনুপাতে কতকগুলি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি—বিশেষ করে মূত্রাশয়ে, অণ্ডনালীতে, একটি বেশ বড়ো টিউমার—বোঝা গেলো যে রোগিণীর দেহে ক্যানসারের বীজ অনেকদিনই বাসা নিয়েছে এবং রক্তক্ষরণ তারই লক্ষণ—দুষ্ট ব্রণ তার দুষ্ট হস্ত দ্রুত ছড়াচ্ছে।

অপারেশন চলবে কিনা এ নিয়ে বেশ মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু প্রোফেসর বললেন—একবার শেষ চেষ্টা করা যাক। কেটে কিন্তু দেখা গেলো আশা তো নেইই—সাদা চোখেই দেখা যায়—যে ক্যানসারের দুষ্ট ক্ষত বহু বিস্তৃত, এমন কি লিভার পর্যন্ত।

প্রোফেসার তার সহকারীকে বললেন—দেখলে তো আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র মহৎ হলে কি হবে শল্যশাস্ত্র শেষ কথা বলে না—সবই ঘটেছে ঐ 'ওভারী' থেকে—এখুনি হয়তো মূত্রবিকার ঘটবে—ঋতুবন্ধের পর কতকগুলি 'ওভারিয়ান কোষ' হঠাৎ দানবের মত পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক উত্তেজনার বশে। ওর সহকারী মাথা নাড়লে, বললে—আসুন আমাদের কাজটা শেষ করে ফেলা যাক—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ ত আমাদের করতে হবে, আশা থাকুক আর নাই থাকুক।

অ্যানা হাসপাতালের উপরের ঘরে ছিল, মাকে নার্সরা এসে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলো। সে ঘুমের ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিল হঠাৎ ঘুম ভেঙে আচমকা বললে ক্ষীণ কণ্ঠে—অ্যানা,

সে আমাকে ভেঙিয়েছিল—

কে, মা মণি?

কালো রাজহাঁস।

আবার ঘুমিয়ে পড়লো রোজেলী—কিন্তু তার পরের কয়েক সপ্তাহ তিনি এই রাজহাঁসকে ভুলতে পারেন নি। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর কষ্ট যন্ত্রণা খুব বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। শীঘ্রই মূত্রবিকারে তিনি আরো আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, সঙ্গে এলো উপসর্গ নিউমোনিয়া।

শেষের দু-এক ঘণ্টা আগে তাঁর মন আবার যেন পরিষ্কার হয়ে এলো। মেয়ে মার হাত ধরে বসেছিল, তার দিকে চোখ চেয়ে রোজেলী বললে কানে কানে (মুখটা নীচু করতে হয়েছিল অ্যানাকে) —অ্যানা শুনছিস?

হ্যাঁ, মা মণি শুনছি।

অ্যানা, কখনো বলিস নি যে প্রকৃতি তোকে ভুল বুঝিয়েছে, বঞ্চনা করেছে, সে যে নিদারুণ, নিষ্ঠুর—ক্রূর। না, না আমার কি যেতে ইচ্ছে করছে তোদের কাছ থেকে, এই জীবন যৌবনের রঙীন মেলা থেকে—কিন্তু মৃত্যুই তো যৌবনের দ্বার—ঐ পথ দিয়েই নূতনের সৃষ্টি হয়, মৃত্যুই জীবনকে এনে দেয় ভালবাসা,—ভালবাসতে শিখিয়ে দেয়, সততা, করুণা এরা ত মিথ্যা নয়।

আর একটু কাছে টেনে এনে মেয়ের কানে কানে রোজেলী বললে—প্রায় শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে হাঁফাতে হাঁফাতে—

প্রকৃতিকেই আমি ভালোবেসেছি—প্রকৃতিও আমাকে ভালো-বেসেছে—অজস্র দিয়েছে—

রোজেলীর মৃত্যুতে অনেকেরই চোখের জল শুকনো ছিল না।

টমাস মান

(জন্ম-১৮৭৫ খ্রীঃ : মৃত্যু-১৯৫৫ খ্রীঃ)

সাহিত্যের জগতে টমাস মান একটি বহু উচ্চারিত নাম। জীবনের দীর্ঘদিন সংসারের অশান্ত ঘূর্ণির মধ্যে বিচরণ করে মান যে বিপুল অভিজ্ঞতার ফসল সঞ্চয় করলেন, তাই তিনি তুলে দিলেন সাহিত্যসৃষ্টির ভাণ্ডারে। জীবনকে এমন বহুদর্শীর দৃষ্টি দিয়ে দেখা; দুঃখের মন্থন থেকে এমনভাবে প্রজ্ঞার অমৃতকে তুলে নেওয়া বোধকরি মানের পক্ষেই ছিল সম্ভব। জীবনের অতলান্ত প্রদেশে যে সকল চোরা স্রোতের টানা-পোড়েন আমাদের চোখে পড়ে না, অত্যন্ত অভিজ্ঞ নাবিকের মত তিনি তার সন্ধান রাখতেন; আর সাহিত্যের জগতে সেই অপরিচিত লোকের সংবাদ পরিবেশন করে বিদগ্ধ পাঠককে বিস্মিত ও অভিভূত করে দিতেন।

টমাস মান সেই শ্রেণীর লেখক যাঁরা সম্মানকে শিরোধার্য করেও এগিয়ে যেতে পারেন। তাই ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল প্রাইজ পেয়েও তিনি থেমে যাননি, নব নব সৃষ্টিবৈচিত্র্যে পূর্ণ করেছেন তাঁর অমূল্য সাহিত্যের ভাণ্ডার। মানের জনপ্রিয়তা তাঁর কোন কোন গ্রন্থের দেড়শতাধিক সংস্করণেই প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশ টমাস মানের সৃষ্টিকে অনুবাদের মাধ্যমে গ্রহণ করে স্ব স্ব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

হিটলারের অভ্যুত্থানের পর মান জার্মান থেকে সরিয়ে নিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্র। সুইজারল্যাণ্ড হলো তাঁর বাসভূমি। এরপর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে সাহিত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র মান লোকান্তরিত হলেন জুরিখে —১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভার বহুমুখী গতি : এই সত্য শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও অর্থনীতিবিদরূপে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি। কখনো একাউন্টটেন্ট জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করেছেন, কখনো ভারতীয়দলের প্রতিনিধিরূপে গিয়েছেন বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করতে সুদূর আমেরিকায়, কখনো মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পরামর্শদাতারূপে কাজ করেছেন, কখনো দামোদর ভ্যালীর আর্থিক উপদেষ্টারূপে। আজও পরিণত বয়েসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট, সিণ্ডিকেট ও ফাইনান্স কমিটির সক্রিয় সদস্য ও নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পারদর্শী হিসেবে তিনি যুক্ত রয়েছেন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধ্যাপকরূপে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি 'নিবেদিতা অধ্যাপক'রূপে কাজ করেছেন। সম্প্রতি তিনি 'হিরণ বসু' বক্তৃতা মালা দিতে আমন্ত্রিত হয়েছেন। প্রতিবেশী অসমীয়া, তামিল প্রভৃতি সাহিত্যে ইনি সুপণ্ডিত এবং এই সব বিষয়ে এবং অরবিন্দ সাহিত্যে এঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ।

কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক হিসেবে সুপরিচিত এই মানুষটি নিষ্ঠাবান অনুবাদকরূপেও এই গ্রন্থে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। শ্রীঅরবিন্দের একটি বিশেষ নাটকের অনুবাদও তিনি সম্প্রতি করেছেন।

হাওড়া জেলার বালীগ্রামের এক সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যবহারজীবী পরিবারের সন্তান শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশের শিক্ষাসংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক অতি সুপরিচিত নাম।